ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো

শায়খ মুজাহিদ আতিয়্যাতুল্লাহ জামাল ইবনে
ইবরাহীম আল-মিসরতি (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ: আল হিকমাহ অনুবাদ টিম

ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো

শায়খ মুজাহিদ আতিয়্যাতুল্লাহ জামাল ইবনে ইবরাহীম আল-মিসরতি (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ: আল হিকমাহ অনুবাদ টিম

প্রকাশনা

আল হিকমাহ মিডিয়া

ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো

মূল
শায়খ মুজাহিদ আতিয়্যাতুল্লাহ জামাল ইবনে ইবরাহীম আল-মিসরতি
(রহিমাহুল্লাহ)
অনুবাদ
আল হিকমাহ অনুবাদ টিম

- **প্রথম প্রকাশ**
  জিলহজ্জ, ১৪৪৫ হিজরী
  জুন, ২০২৪ ইংরেজি

- **প্রকাশক**
  আল হিকমাহ অনুবাদ টিম

সূচিপত্র

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

পরসমাচার, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে বলেন;

وما ينطق عن الهوى

"এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না।"

ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"তিনি নিজ প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছা থেকে কোনো কথা বলেন না।"

إن هو إلا وحي يوحى

"এটাতো ওহী যা তাঁর কাছে প্রত্যাদেশ করা হয়।"

অর্থাৎ তিনি কেবল তাই বলেন যা তাঁকে আদেশ করা হয়। যা তিনি লোকদের কাছে কোনো ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং হেরফের ছাড়াই পরিপূর্ণরূপে পৌঁছে দেন।

যার ফলে আহলে ইলমগণ ওহীর এ দ্বিতীয় প্রকার তথা হাদীস এর প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছেন, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, অনেক গবেষণা করেছেন এবং এর মর্ম ও উদ্দেশ্য নিয়েও করেছেন অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। তাঁরা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। তবে এমন কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলো খুবই ভাবপূর্ণ এবং বিশ্লেষণধর্মী, যার ফলে সেগুলোকে স্বতন্ত্র কিতাবে প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নের হাদীসগুলো সবিশেষ উল্ল্যেখযোগ্য।

انما الاعمال بالنيات،حديث جبرائيل،حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك،وحديث المسيء صلاته،وحديث المجمع في نهار رمضان،وحديث الافك،وبدا الاسلام غريبا،وحديث بريره انما الولاء لمن اعتق،وحديث ام زرع،

এ ধরনের আরো যে হাদীস রয়েছে এগুলোকে সর্বযুগের উম্মাহর আহলে ইলম উলামাগণ নিজেদের কাজের বিশেষ অংশ বানিয়েছেন। কেননা হাদীস শাস্ত্র ছিল তাদের বিশেষ আগ্রহের বিষয়। এ ধারাবাহিকতারই অংশ হিসেবে আশ শায়খ, মুজাহিদ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ; (আল্লাহ তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন) রাসূলের একটি সারগর্ভপূর্ণ সংক্ষিপ্ত হাদীস নির্বাচন করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের আদব এবং দাওয়াতের আদব সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ কয়েকটি শব্দে তুলে ধরেছেন। তবে এই কিতাবটি শুধু হাদীসে নববীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ নয়। বরং হাদীসের ব্যাখ্যা ছাড়াও এই গ্রন্থে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে, পাঠক মাত্রই যার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

সর্বোপরি তিনি একজন সর্বসমাদৃত আলেম; জিহাদ ও দাওয়াতের ময়দানে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি বাস্তব জীবনেও এগুলোর অনুশীলন করেছেন। তবে বিশ্বাসঘাতক আমেরিকার আকস্মিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে তিনি তাঁর শুরু করা কাজ পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারেননি। যদিও এ ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘ একটা পথ অতিক্রম করেছেন।

এখানে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক মাসআলা, বিভিন্ন সতর্কবাণী এবং অনেক চমৎকার ও অসাধারণ ভাবনার সমাহার, যা অবশ্যই একজন পাঠককে এই কিতাবের প্রতি মনোনিবেশ এবং দৃষ্টিপাত করতে উদ্দীপ্ত করবে। শায়খ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবি (আল্লাহ তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন) প্রণীত বক্ষ্যমান এই গ্রন্থটি '**طلائع خراسان**' (তালাইয়ে খোরাসান) নামক পত্রিকায় ছাপা কিছু প্রবন্ধের সমষ্টি। পাঠকদের উপকার ও সহজবোধ্যতার দিকটি বিবেচনা করে আমরা উক্ত প্রবন্ধগুলোকে এক মলাটে নিয়ে এসেছি এবং এর একটা বিস্তারিত সূচি প্রস্তুত করেছি। আমরা আল্লাহর কাছে কেবল এই প্রার্থনাই করব, আল্লাহ যেন

শায়খ রহিমাহুল্লাহকে তাঁর রহমতের কোমল চাদরে আবৃত করেন, তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করেন এবং তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন।

মুআসসাসাতুন নুখবা

১৪৩৪ হিজরী, ২০১৩ ইং

প্রথম মজলিস

الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه وجنده وبعد

আমি প্রায় দীর্ঘ সময় ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ নিঃসৃত কিছু গুঢ় তত্ত্বপূর্ণ শব্দমালায় একেবারে বিমোহিত ছিলাম এমনকি সে শব্দগুলো থেকে একটি শব্দ দ্বারা আমি এই কিতাবের শিরোনাম রচনা করেছি। আমি সেগুলি নিয়ে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করেছি, বিশ্লেষণ করেছি এবং বাস্তব জীবনে আমলেরও চেষ্টা করেছি। আমি প্রতিদিনই সে শব্দমালার জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সেগুলি দ্বারা আমার আবেগ অনুভূতিকেও দীপান্বিত করছিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিই অনেক গুঢ়তত্ত্ব এবং বিশ্লেষণধর্মী বাক্যমালা দান করা হয়েছে। তিনি অল্প কথায় অনেক ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। যার নমুনা হাদীসের কিতাবগুলোতে অসংখ্য, অগণিত। সামনের আলোচিত হাদীসটিকে আমরা এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপণকে খুব বেশি ভালোবাসতেন এবং এভাবেই তিনি আদিষ্ট হয়েছেন। সংক্ষেপণ হচ্ছে; বালাগাত শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। যা একটি শব্দের অর্থ পরিপূর্ণরূপে ঠিকই প্রকাশ করবে বাকি সংক্ষিপ্ত আকারে এবং স্বল্প শব্দে। এতে রয়েছে অনেক নান্দনিক ও চমৎকার অলিগলি, বালাগাতের বিভিন্ন কিতাবে যার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই বাক্যটি আমার প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে; বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া। প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের প্রেক্ষিতে

এবং উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রবন্ধগুলোতে বিভিন্ন বিষয় নিয়েও বিস্তর আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

শুরুতেই আমরা ওই হাদীসটি নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ এই নববী শব্দটি এসেছে। কোনো কোনো শব্দ নিয়ে আমরা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করব। এরপর আল্লাহ তাআলার তাওফীক অনুযায়ী বিবিধ মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা করব। ভরসা একমাত্র আল্লাহরই উপর।

হাদীসটি একটু ভালো করে লক্ষ করুন।

হাদীসটি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ ইমাম বুখারী এবং মুসলিম রহিমাহুল্লাহ উভয়ে হাদীসটি একাধিক সূত্রে সাহল ইবনে সাদ এবং সালামা ইবনে আকওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে আমরা এখানে কেবল হাদীসের ঐ সূত্রটি বর্ণনা করব, যেখানে হাদীসের পরিপূর্ণ শব্দ এসেছে এবং অন্যান্য হাদীসে যে সমস্ত অতিরিক্ত শব্দ এসেছে সেগুলো নিয়েও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ : " لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ". قَالَ : فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ : " أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ " فَقِيلَ : هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. قَالَ : فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ : " انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে কিতাবুল মাগাযীতে গাযওয়ায়ে খাইবার অধ্যায়ে বলেন, আমাদেরকে কুতাইবা ইবনে সাদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইয়াকুব ইবনে আব্দুর রহমান, আবু হাজেম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে সাহল ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের দিন বলেন, অবশ্যই আমি এই পতাকা আগামীকাল এমন এক লোকের হাতে দিব যার হাতে আল্লাহ তাআলা খাইবারের বিজয় দান করবেন। তিনি আল্লাহ এবং রাসূলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন। লোকজন অস্থির এবং পেরেশান হয়ে ঐ রাত্রি কাটালো! এ কারণে যে, কাকে ওই পতাকাটি দেয়া হবে? ভোর হতে না হতে লোকজন রাসূলের কাছে ছুটে আসলো এবং প্রত্যেকেই আশাবাদী যে, তাঁকে উক্ত পতাকাটি দেয়া হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে বিস্মিত করে বললেন; আলী ইবনে আবু তালেব কোথায়? তখন বলা হলো; ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি তো চোখের পীড়ায় ভুগছেন। তখন কয়েকজন লোককে তাঁর কাছে পাঠানো হলো এবং তাঁকে নিয়ে আসা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন। এতে তিনি এতটাই আরোগ্য লাভ করলেন যে, তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি ইতিপূর্বে কোনো ব্যথায় আক্রান্তই হননি। যাই হোক; এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পতাকাটি দিলেন। তখন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি তাদের সাথে এতটাই বীরদর্পে লড়াই করব যাতে তারা আমাদের মতো হয়ে যায় অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আলী! তুমি ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো। তুমি প্রথমে তাদের ভূমিতে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলার হকগুলোর মধ্য থেকে কোন কোন বিষয় তাদের উপর আবশ্যক। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি আল্লাহ তাআলা তোমার হাতে একজন ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শন করা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক উত্তম।"

ঘটনার ইতিবৃত্ত ও হাদীসে বর্ণিত اليوم এর অর্থ

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঘটনাটি খাইবারের দিন ঘটেছে। আর এখানে اليوم দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে; উল্লেখিত ঘটনার দিনগুলো অথবা খাইবারের যুদ্ধ এবং তা বিজয়ের দিন। সুতরাং শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় يوم দ্বারা শুধু একদিন উদ্দেশ্য হওয়া জরুরি নয়। এখানে يوم তার পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়,

"أيام العرب، يوم ذي قار، ويوم بُعاث"

“আরবের প্রাচীন ইতিহাস, আরব অনারবের যুদ্ধের দিনগুলো, আউস খাজরাজের সর্বশেষ যুদ্ধের দিনগুলো"

এমনিভাবে ইসলামেও পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত অনেক يوم আছে। যেমন;

يوم بدر، ويوم أحد، ويوم الخندق، ويوم القادسية، ويوم اليرموك.

-বদরের যুদ্ধের দিন, উহুদের যুদ্ধের দিন, খন্দকের যুদ্ধের দিন, কাদেসিয়্যার যুদ্ধের দিন, ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন-ও অন্যান্য।

ঠিক এগুলোর মতোই ايام الله এই শব্দটি, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, “এবং তাদেরকে আল্লাহর দীনসমূহ স্মরণ করান।” এবং হাদীসে নববীর শব্দের দিকে তাকালে এমনটি বুঝে আসে; সাহাবী সাহাল ইবনে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের দিন বলেছেন, “আমি অবশ্যই আগামীকাল পতাকাটি প্রদান করব।”

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে ঘটনাটি যুদ্ধে যাওয়ার একদিন পূর্বে ঘটেছে, যেদিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে খাইবারের দুর্গগুলো বিজিত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন يوم خيبر, তো يوم দ্বারা কি উদ্দেশ্য সেটা এখনে স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার প্রান্তরে প্রায় এক মাসের মতো অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং অবশেষে তার এক একটি দুর্গ করে বিজয় করেছিলেন তারপরও

শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। يوم অর্থাৎ এখানে يوم خيبر বলেছেন কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম খাইবারের বড় দুর্গটি বিজয় করার জন্য দিনের পর দিন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আয়ত্তে নিতে পারছিলেন না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لأعطين الراية غدا....

হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির পরে সপ্তম হিজরীতে খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে শত্রু হিসেবে ছিল অভিশপ্ত ইহুদীরা। (আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুক।) ইহুদীদের মধ্য থেকেই একটি দল শাম এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে হিজরত করে সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করে আসছিল। তাদের আরেকটি দলকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তখন তারাও সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আর তারা হচ্ছে বনু নাযির, বনু কুরাইযা এবং বনু কায়নুকার মধ্য থেকে কিছু লোক। তারা ছিল কৃষিজীবী এবং ব্যবসায়ী। তারা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তাদের মজবুত দুর্গেই বসবাস করত। তাদের অনেকগুলো দুর্গ ছিল এবং প্রতিটির আলাদা আলাদা নাম ছিল। সবচেয়ে বড় দুর্গটির নাম হচ্ছে, হিসনে কামুস। আর এই দুর্গটিই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বিজয় করেছিলেন এবং উক্ত হাদীসের ঘটনা এই দুর্গটিকে কেন্দ্র করেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার অঞ্চল বিজয় করলেন। তখন ইহুদীরা প্রস্তাব দিল যে, তিনি যেন তাদের ধন সম্পদের ব্যাপারে অর্ধার্ধি মুআমালা করেন। (অর্থাৎ প্রতিবছর তারা চাষাবাদ করে যে ধন-সম্পদ অর্জন করবে সেখান থেকে তারা অর্ধেক নিবে আর মুসলমানদের অর্ধেক দিবে) যেহেতু তারা কৃষক সম্প্রদায় ছিল এবং এ বিষয়ে তারা ভালো বুঝতো তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। তবে এই শর্তটাও করে রেখেছিলেন যে, যখন তিনি তাদেরকে দেশান্তর করতে চাইবেন, তখন তাদেরকে দেশান্তর করতে পারবেন। এরপর থেকে তারা তাদের এই শর্তের উপরে ছিল অবশেষে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে তাদেরকে দেশান্তর করেন।

পতাকার অর্থ, গুরুত্ব এবং এটি কিসের প্রতীক:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি অবশ্যই পতাকা দিব, অর্থাৎ যখন থেকেই মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও জাতিতে বিভক্ত হতে থাকলো, বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল তখন থেকেই মানুষ যুদ্ধের ময়দানে বিভিন্ন ধরনের পতাকার ব্যবহার করে আসছিল। যে পতাকার মাধ্যমে তারা শত্রুপক্ষ থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখতো। এর ফলে যে দল থেকে দূরে থাকে কিংবা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে ওই পতাকা দেখে তৎক্ষণাৎ তার দলে এসে ভিড়ে। আর যখন দেখে ওই পতাকা কোনো উচ্চস্থানে পতপত করে উড়ছে, তখন তাদের মনোবল এবং ইচ্ছা শক্তি আরো প্রবল হয়ে ওঠে। আবার কখনো কখনো তা শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত করে এবং তাদের মনে ভয়ভীতি সঞ্চার করে। এছাড়াও পতাকার রয়েছে আরো অনেক উপকারিতা যা কারো অজানা নয়। এ কারণেই প্রতিটি জাতি-সম্প্রদায়, হোক সে আরব কিংবা অনারব, তারা নিজস্ব পতাকা উড়িয়ে জাতীয় সংগীত গায়। কখনো তা বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকে আবার কখনো সৈন্যবাহিনীর উপরে ধরা হয়। এমনকি প্রতিটি জাতি-সম্প্রদায় পতাকার রং এবং প্রতীক অনুযায়ী তাদের জাতীয় সংগীত গাইতে থাকে। এই পতাকা একটি জাতির পরিচয় বহন করে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতাকা গ্রহণ করেছেন। যেহেতু এতে বাহ্যিক কিছু ফায়দা রয়েছে, যার কিছু আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি, আর এটিই ছিল তাঁর আদর্শ ও শরীয়ত।

এ সব কিছুতেই রয়েছে ইহকালীন কিংবা পরকালীন কল্যাণ। ইসলামের পূর্বেও যার প্রচলন ছিল। বর্তমানেও বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় তা ব্যবহার করে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-র অনুমোদন দিয়েছেন অথবা এ বিষয়ে আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে বিষয়টাকে আরো মজবুত করেছেন। পাশাপাশি এর ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। কল্যাণকর দিকগুলোর প্রতি উম্মাহকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তবে এখানে আমরা সে বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করছি না।

মোটকথা, পূর্ব থেকেই মানুষ যেটাকে পতাকা হিসেবে চিনে আসছিল, সেই পতাকার আলোচনা এখানে হচ্ছে। তাকে لواء البند ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। যার অর্থ পতাকাই। কিন্তু বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন গাযওয়া ও সারিয়া এবং সেগুলো প্রেরণ পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে الراية واللواء এর অর্থ নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। কেউ বলেছেন; এ দুটি সমার্থক শব্দ। আবার কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তবে উভয়টি যদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে হয়ে থাকে তাহলে উভয়ের মাঝেই বা কী ব্যবধান ?

তবে আমার মতামত হচ্ছে, তা কখনো একই অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার কখনো কখনো ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যদি একই জিনিস হয় তাহলে তাকে راية অথবা لواء উভয়টিই বলা যাবে। যেমন বুরাইদা আল আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ এবং অন্য ইমামগণ إني دافع اللواء غدا এই শব্দে বর্ণনা করেছেন। তবে যদি একটির অর্থ দেশ পরিচালনা করা এবং সৈন্য বাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য হয়ে থাকে এবং অপরটির অর্থ অন্যান্য শাখাগত ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় অথবা নির্দিষ্ট কোনো দল অথবা কোনো সৈন্য বাহিনীর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমটিকে لواء বলা হবে এবং দ্বিতীয়টিকে راية বলা হবে। والله أعلم

তবে এ বিষয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। আমরা এখানে ইতিহাস ও সভ্যতা থেকে কয়েকটি বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবো। উদাহরণত, পতাকার আকৃতি, তার রং, তার লেখা এবং তাতে কি কি বিষয় লক্ষ্যণীয়, পাশাপাশি এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আচরণবিধি কেমন ছিল এবং আমাদের জন্য অনুসরণীয় বিষয় কোনটি। এছাড়াও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

পতাকার ভিন্ন একটি অর্থ:

এখানে আমরা পতাকার রূপক ও ব্যবহারিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করব, যা বিভিন্ন হাদীসে এসেছে।

যেমন একটি হাদীসে রয়েছে,

"من قاتل تحت راية عُمِّية"

“যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের অধীনে (পতাকা তলে) যুদ্ধ করে।”

এখানেও راية শব্দ বলা হয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, কোনো বিষয়ের সাথে অন্য আরেকটি বিষয়ের বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলে একটির ক্ষেত্রে অন্যটির শব্দকে রূপকার্থে ব্যবহার করা যায়, এটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

পূর্ব থেকেই আমরা বলে এসেছিলাম, যারা যে পতাকা গ্রহণ করে এবং উড্ডয়ন করে, তারা সে জাতি কিংবা সম্প্রদায়ের পরিচয় বহন করে। অথবা কোনো মানব শক্তি কিংবা জাতিসত্তা অথবা কোনো ধর্মীয় সংগঠন ইত্যাদির পরিচয় বহন করে। প্রতিটি সম্প্রদায়ই একটি বিশেষ পতাকা গ্রহণ করে, যে পতাকা তার পরিচয় ফুটিয়ে তোলে, তাকে অন্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে রাখে, সে ঐ জাতির স্লোগান দেয়। ওই জাতীয়তার প্রতি আহ্বান করে। সে তার জাতির চিন্তাভাবনা ও দর্শনকে অন্য জাতির সামনে ফুটিয়ে তোলে। ফলে প্রতিটি জাতি তার নিজস্ব পতাকাকে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করে যেখানে দিবালোকের আলোর ন্যায় তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যা আমরা যুগ-যুগ ধরে দেখছি। সুতরাং راية শব্দটির অর্থ হিসেবে যেই দুইটি বিষয় আমরা দেখতে পেলাম; একটি হলো কাপড়ের তৈরি পতাকা আরেকটি হলো আদর্শ বা মতাদর্শ—এই শাব্দিক অর্থ ও রূপক অর্থের মধ্যকার সম্পর্কটা আমাদের ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে অনেকটা স্পষ্ট। সুতরাং মুসলিমরা ইসলামী পতাকার ছায়াতলে থেকে লড়াই করে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন সেই দীনের ছায়াতলে থেকে লড়াই করে। অপরদিকে কাফেররা কুফরী সম্প্রদায়ের (ইহুদী, খ্রিস্টান, মূর্তিপূজারি, অগ্নি পূজারি অথবা অন্যান্য কাফের সম্প্রদায়) পতাকার ছায়াতলে থেকে লড়াই করে। এখন যুদ্ধের ময়দানে তার সেই নিজস্ব পতাকা উত্তোলন করুক বা না করুক সেটা দেখার বিষয় নয়।

মার্কিন সৈন্যবাহিনী আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ঠিক তাদের দেশের এই নামটি তাদের রক্ত-ঘাম, জাতীয়তা, চিন্তা-বিশ্বাস, দর্শন

ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় বহন করে। তারা একে আমেরিকান মূল্যবোধ, আমেরিকান সভ্যতা, আমেরিকান সংস্কৃতি, গর্ব, শক্তি এবং আমেরিকান জাতীয়তাবাদ বলে আখ্যায়িত করে। মোটকথা, কেউ মার্কিন বাহিনীর সদস্য হওয়া মানে হচ্ছে: এ রাষ্ট্রের প্রতি সাহায্য ও আনুগত্যের হাত প্রসারিত করা এবং আমেরিকার পতাকাতলে থেকে যুদ্ধ করা। অপরদিকে একজন মুসলিম মুজাহিদ ইসলাম ধর্মের পতাকা তলে থেকে লড়াই করে যায়, অন্য কোনো ধর্মের পতাকা তলে থেকে নয়। তা হয়ে থাকে একমাত্র দীনের জন্যই এবং তার বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য; অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়। সর্বোপরি সে ইসলামের পতাকাতলে থেকে লড়াই করে। সুতরাং যদি ইসলামী কোনো ভূখণ্ড থাকে তাহলে সে ইসলামের পতাকা উড্ডয়ন করবে এবং সে ইসলামী রাষ্ট্রের পতাকা তলে থাকবে; পক্ষান্তরে যদি ইসলামী কোনো ভূখণ্ড না থাকে তাহলে সর্বাবস্থায় খোদ ইসলামই একটি পতাকা হিসেবে বিবেচ্য হবে। এখন চাই কাপড়ের টুকরা সেই পতাকাটি উত্তোলন করা হোক বা না হোক সেটা বিবেচ্য নয়। মোটকথা এখানে পতাকা ঐ অর্থে হবে যেটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করে এসেছি।

পতাকার বিষয়ে কিছু প্রচলিত ভুল

এক্ষেত্রে প্রচলিত কিছু ভুল লক্ষ করা যায় যেমন, জিহাদ বৈধ হওয়ার জন্য সকল মুসলমানকে সর্বজনবিদিত এক আমীরের নেতৃত্বে একত্রিত হতে হবে। কিন্তু এ বিষয়টি একদমই অলীক ও ভিত্তিহীন। বরং ক্ষমতাধর কোনো ইমাম তথা খলীফাতুল মুসলিমীন অথবা তার মতো কারো অধীনে জিহাদের বৈধতা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে আমরা আপাতত আলোকপাত করবো না। তবে এটা ঠিক যে, মুসলমান বিশেষ করে মুজাহিদের উপর অবশ্যক হচ্ছে— তারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এক সারিতে থাকবে, আল্লাহর রজ্জুকে সবাই মিলে আঁকড়ে ধরবে এবং বিচ্ছিন্ন হবে না। তবে কথা হচ্ছে, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং এক প্ল্যাটফর্মে আসাকে জিহাদ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা নিতান্তই ভুল। আবার কেউ কেউ এ ধারণা করে বসে আছেন যে, তিনি যে দলের অধীনে থেকে লড়াই করবেন, তা অবশ্যই সালাফি মানহাজ, আল্লাহ ভীরু, স্বচ্ছ এবং সুশীল হতে হবে। এটাও একটি ভুল ধারণা। কেননা আমারা ওই আদর্শই লালন

করি, যে আদর্শের উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন।

আমরা এটাও মনে করি, আমীর এবং সৈন্যবাহিনী নেককার (সৎকর্মশীল) হোক বা না হোক, তাদের সাথে জিহাদ করা বৈধ। সকল প্রশংসা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। এ বিষয়গুলো নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার কিতাব এবং ফিকহের কিতাবগুলোতে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, আমরা শাসকবর্গকে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং কল্যাণের প্রতি আহ্বান করা থেকে বিরত থাকবো। বরং প্রয়োজন অনুসারে এবং অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করার লক্ষ্যে আমরা আমাদের কার্যক্রম হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে চালিয়ে যাব।

১৪২০ হিজরীর পরে এসে কোনো এক আহলে ইলম ইরাক ইস্যুতে বলেছেন, এখন যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো দল পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং এখন জিহাদ বৈধ নয়। এটা তার মারাত্মক পর্যায়ের একটা ভুল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এবং আমাদের সকলকে সুবোধ দান করুক। তার উক্ত মন্তব্য একদমই কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত। একজন আহলে ইলম হয়ে এমন মন্তব্য কীভাবে করতে পারেন? (সকল কর্তৃত্ব মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই এবং তিনিই তাঁর সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বের অধিকারী।) পতাকাবাহী দল অবশ্যই রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীতে সুন্নি-সালাফী মুজাহিদদের অনেক দল এবং সংগঠন রয়েছে। তবে আলহামদুলিল্লাহ একটি বাস্তবতা হলো, যারা অনেকটা অন্তরালে থাকে কোনো প্রয়োজনে, তারা যখন দীনের স্বার্থে কারো সমালোচনা করেন এবং করতে বাধ্য হন, তখন তারা বিদ্বেষপ্রসূত অন্যদের সমালোচনার শিকার হন। আর যে জানে না, তার জন্য কখনোই না জেনে কথা বলা বৈধ নয়। কেননা কেউ যদি না জেনে, না শুনে কোনো কথা বলে, তাহলে তাকে এর জন্য জাহান্নামের ৭০ খরিফ অর্থাৎ ৭০ হাজার বছরের পথের পরিমাণ দূরত্বে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং কেউ যদি ঠুনকো কোনো অজুহাত দেখিয়ে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখে তাহলে সে অবশ্যই বিরাট গুনাহের ভাগীদার হবে।

সুতরাং এটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, কোনো দল না থাকুক তারপরেও জিহাদ সর্বাবস্থায় বৈধ। কেননা এ লড়াই তো কট্টর ক্রুসেডারদের প্রতিহত করার

লড়াই। যারা দীন-দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সকলের ঐকমত্যে কুফরী শক্তিকে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে প্রতিহত করা ফরয তথা আবশ্যক। সকল মুসলিমের উপর আবশ্যকতা পর্যায়ক্রমে আসবে। অর্থাৎ আক্রান্ত ভূমির সবচেয়ে কাছে যারা, তাদের ওপর আবশ্যকতা আসবে সবার আগে। এরপরে যারা নিকটবর্তী তাদের ওপর আবশ্যকতা আসবে দ্বিতীয় স্তরে। এভাবে সকলের উপর আবশ্যকতা চলে আসবে। এক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই। জিহাদ বৈধ হওয়ার জন্য অন্য কোনো শর্ত করা যাবে না। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল মাযহাবের উলামায়ে কেরামের মতামত এবং ফতোয়া একদমই স্পষ্ট। আমরা তো আল্লাহর জন্যই এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

"من قاتل تحت رايه عمية" হাদীসের ব্যাখ্যা

এ হাদীসটি মুসলিম রহিমাহুল্লাহ তাঁর সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ

অর্থঃ "আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্রপ্রীতির কারণে ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্র প্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো ব্যাপার থাকে না) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করে। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপর আক্রমণ করে, আমার উম্মাতের ভালোমন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে; মুমিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে সে ওয়াদাবদ্ধ হয় তার ওয়াদাও রক্ষা করে না, সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই।"

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, الراية العمية দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন অস্পষ্ট বিষয় যার কোনো দিকই স্পষ্ট নয়। এটাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ এবং জমহুর উলামায়ে কেরামের মত। ইসহাক ইবনে রাহুইয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি শুধু জাতীয়তার জন্য লড়াই করা। এমনটা ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন। العمية শব্দটি العمى থেকে গৃহীত। যার অর্থ দাঁড়ায় গোমরাহী, দৃষ্টিহীনতা। সুতরাং এ গুণের অধিকারী ব্যক্তি না কোনো হকের জন্য লড়াই করে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কোনো ইলমের ভিত্তিতে লড়াই করে। বরং সে নিজের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে কিংবা তার দেশ এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে লড়াই করে। কিন্তু সে হকের সাথে আছে না নেই, এর কোনো বালাই নেই। অথবা এটা আল্লাহ তাআলার পছন্দ কিনা এবং সে আল্লাহ শরীয়তের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আদিষ্ট কিনা এরও কোনো তোয়াক্কা নেই।

সুতরাং যুদ্ধের ময়দানে যার এই অবস্থা, তার ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করে। যারা বাতিলের উপর থেকে মৃত্যুবরণ করে, তাদের মৃত্যুকে যদি জাহিলিদের মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়? তাহলে যে ব্যক্তি জেনে শুনে খোদ বাতিলের জন্য লড়াই করে তার অবস্থা কেমন হবে? সে স্পষ্টই জানে যে, সে বাতিলের উপরে আছে, ইসলামের বিপরীতে গিয়ে কুফর-শিরকের জন্য লড়াই করছে এবং কুফরী শক্তিকে আরো শক্তিশালী করছে। তাদের জুলুম নির্যাতন স্বেচ্ছাচার, অবাধ যৌনাচার ও অশ্লীলতা এবং জমিনে অন্যায় অবিচারের ক্ষেত্রে তাদের শক্তিকে আরো পাকাপোক্ত করছে। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা শান্তি এবং নিরাপত্তা চাই। আমীন।

আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে লড়াই করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, উক্ত হাদীসেরই এই অংশ

يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً

গোত্রপ্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্র প্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো ব্যাপার থাকে না)। এখন আমরা যদি একটু তারকিবি আলোচনা করি তাহলে, উক্ত বাক্যটি ব্যাখ্যাকারী বাক্য

হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তারকিবে যার কোনো স্থান নেই। যেমনটা অধিকাংশ নাহুবিদ বলেছেন। অথবা এটি ব্যাখ্যা কারী বাক্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে যেমনটা কোনো কোনো নাহুবিদ বলেছেন; তখন এটি তার ইসমের মতোই পূর্ববর্তী জুমলার তাফসীর হবে। অথবা তা জুমলায়ে হালিয়া হয়ে নসবের স্থানে আছে। হালের বাক্যটি তার আমলের শর্ত হিসেবে হবে। অথবা তা সবচেয়ে দুর্বল মতে নতুন বাক্য হবে এবং তারও তারকিবে কোনো স্থান নেই। তখন তা পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আর থাকবে না। এখানে আমরা যে বিবেচনা করিই না কেন, يغضب لعصبة বাক্যটি এবং এই বাক্যের উপরে যে সমস্ত বাক্যকে সংযুক্ত করা হয়েছে সবগুলো বাক্যই من قاتل ... এ বাক্যের ব্যাখ্যা এবং এ বাক্যকেই দৃঢ়তা দান করে। আশা করি এই বিষয়টি স্পষ্ট ইনশাআল্লাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি এখন লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে লড়াই করে সে গোত্রপ্রীতির জন্যই লড়াই করে, সে তার গোত্রপ্রীতির জন্যই ক্রোধান্বিত হয়, সেই গোত্রপ্রীতির প্রতি আহ্বান করে এবং এই গোত্রপ্রীতির জন্যই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ যেখানে দীনের কোনো বালাই থাকে না।

গোত্রপ্রীতি: যে উদ্দেশ্যে মানুষ একটি পক্ষ অবলম্বন করে অর্থাৎ তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং সর্বদা তার সাথেই থাকে। যেমন দেশ জাতি এবং অন্যান্য। সুতরাং এ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকা তলে থেকে লড়াই করে।

একটি মাসআলা:

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো দল অথবা দেশের পতাকা তলে থেকে লড়াই করে, আর ওই দেশ বা দল ভুলের উপরে থাকে, কিন্তু ওই ব্যক্তি জাতীয়তাবাদের জন্য, এই জাতীয়তাবাদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য অথবা তার প্রতি লোকদেরকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে লড়াই করে না; বরং অন্য কোনো কারণবশত সে ব্যক্তি এই দলের সাথে থেকে ভালো কোনো উদ্দেশ্যে লড়াই করে, তখন তার হুকুম কি হবে? সামনে এর কিছু উদাহরণ দেয়া হলো। যেমন কোনো ব্যক্তি পরিস্থিতির শিকার হয়ে কোনো কাফের শাসকের অধীনে থেকে লড়াই করল। যেমন ইরাকে আমেরিকার প্রথম হামলার সময় অনেকেই সাদ্দামের অধীনে

থেকে এই কট্টর ক্রুসেডারদের প্রতিহত করার জন্য লড়াই করেছে। কেননা সেই মুহূর্তে অন্য কোনো হকপন্থী দল কিংবা পতাকা ছিল না। অথবা থাকলেও তাদের সাথে যুক্ত হওয়া অসম্ভব ছিল। অথবা কোনো কাফের বাহিনীর সাথে থেকে অন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তবে সেটাও কেবল ইসলাম এবং মুসলমানদের কোনো কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে। কেননা তাদের এক দল অপর দলের ওপর বিজয় হওয়ার মধ্যে মুসলমানদের অনেক স্বার্থ নিহিত। অথবা সামরিক প্রশিক্ষণ এবং সামরিক শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অনেক ফকিহ ফতোয়া দিয়েছেন।

তবে এই মাসআলার হুকুম কিন্তু ব্যাপক নয়, বরং প্রয়োজন অনুসারে তা সীমাবদ্ধ থাকবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উলামায়ে কেরাম এবং আস্থাভাজন মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করতে হবে। তাহলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে না, "যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বে লড়াই করে ... (থেকে হাদীসের শেষাংশ পর্যন্ত) ... সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।" কেননা এখানে আমরা পূর্বে যেই শর্ত এবং গুণাগুণ বর্ণনা করে এসেছি তা নেই। তাহলে হাদীসের অর্থ দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকা তলে থেকে উক্ত উদ্দেশ্যে এবং উক্ত পদ্ধতিতে লড়াই করবে, সে যদি ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহর অবাধ্য এবং কবীরা গুনাহকারী হিসেবে বিবেচ্য হবে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

স্বজাতীয় পতাকা নিয়ে কোনো মুসলমান মুসলিম বাহিনীর অধীনে লড়াই করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোত্রের পতাকা তলে লড়াই করাকে পছন্দ করতেন। যেমনটা মুসনাদ এবং অন্যান্য গ্রন্থে আম্মার ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যদিও এ হাদীসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু এই হাদীসেরও অনেকগুলো শাওয়াহেদ (তথা কাছাকাছি বর্ণনা) রয়েছে। সুতরাং এই অর্থটি যথাযথ ইনশাআল্লাহ। এ কারণেই শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ উক্ত হাদীসটিকে তাঁর সিলসিলায়ে সহীহা গ্রন্থে হাসান বলেছেন। এ হাদীসের অন্যতম একটি শাওয়াহেদ সহীহ বুখারীতে আছে। তা মক্কা বিজয় এবং আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারওয়ান এবং মিসওয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বললেন, এরপর একটি বিরাট

বাহিনী তার সামনে আসলো, এত বিরাট বাহিনী সে সময় তিনি আর দেখেননি। তাই বললেন এরা কারা? বলা হলো, এরাই হচ্ছে আনসার সাহাবীগণ। সাদ ইবনে ওবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের নেতৃত্বে আছেন এবং তাঁর হাতেই তাঁদের পতাকা। এ হাদীসের আরেকটি অংশ, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দল আসলো এবং তার পতাকা ছিল জুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে।

এটাই ছিল মুসলিম সৈন্যবাহিনী সাথে রাসূলের কর্মপদ্ধতি। একারণে উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে নিঃশর্তভাবে বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার জাতির পতাকা তলে থেকে লড়াই করা সুন্নত। আর এমনটাই বলেছেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ। ইমাম ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া নামক গ্রন্থে একথাই উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বিষয়টি আরো অন্য ইমামগণ উল্লেখ করেছেন। সামনে হাদীস থেকে এবং সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন আমল থেকে কিছু ঘটনা উল্লেখ করব,

০১. আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন বিশিষ্ট নকীব (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি) ছিলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বলা হয়ে থাকে তিনি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন। মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর সাথে তাঁর গোত্রের পতাকা ছিল। (তাঁরা আমর ইবনে আউফের বংশধর, খাজরাজ গোত্র।) তিনি বিশুদ্ধ মতে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সূচনা লগ্নে ইন্তেকাল করেন। [ফাতহুল বারী ৬/৩৪৮, তাহজিবুত তাহজিব]

০২. ওয়ায়েল ইবনে হাজার রাযিয়াল্লাহু আনহু সিফফিনের যুদ্ধের সময় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর গোত্রের পতাকাতলে ছিলেন। [সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/৫৭২]

০৩. আউফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর নিজ গোত্রের পতাকা ধারণ করেছেন। [আল কাশিফ, মুস্তাদরাকে হাকেম, আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, হিজরী ৭৩ সনের ঘটনাবলী]

০৪. মক্কা বিজয়ের দিন জাবের ইবনে আতিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সগোত্রের পতাকা ছিল। [আল-ইসাবা, তাহাজিবুত তাহজিব]

০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে কাসির আবু জাবইয়ান আল-আরাজ আলগামিদী রাযিয়াল্লাহু আনহু কাদেসিয়ার দিন নিজ গোত্রের পতাকা ধারণ করেছিলেন। আল-ইসাবা।

০৬. খুজাইমা ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কা বিজয়ের দিন নিজ গোত্র তথা বনু খতমার পতাকা তাঁর হাতে ছিল। তিনি দুই শাহাদাতের অধিকারী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। [সিফাতুস সাফওয়া, ইবনে জাউজি]

০৭. মক্কা বিজয়ের দিন কাতাদা ইবনে নুমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সগোত্র তথা বনু জফরের পতাকা ছিল। মুস্তাদরাকে হাকেম, দাদা কাতাদা ইবনে নোমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী।

০৮. মক্কা বিজয়ের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ ইবনে আবদে রব্বেহি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বনু হারেস ইবনে খাজরাজ গোত্রের পতাকা ছিল।

এই সাহাবীর মাধ্যমেই আযানের প্রচলন ঘটেছিল। [মুস্তাদরাকে হাকেম, আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ ইবনে আব্দে রাব্বিহি আল-আনসারী এর জীবনী, তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ।]

০৯. মাখনাফ ইবনে সুলাইম আল-আজদী আলগামিদি রাযিয়াল্লাহু আনহু সুলাইমান ইবনে সারদের সাথে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন এবং আইনুল ওরদা নামক যুদ্ধে ৬৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সিফফিনের যুদ্ধের সময় তাঁর হাতে আজদ গোত্রের পতাকা ছিল। [তাহজিবুত তাহজিব।]

১০. ওমারা ইবনে হাজম রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মক্কা বিজয়ের দিন নিজ গোত্র তথা মালেক ইবনে নাজ্জারের পতাকা ছিল। [আল-ইকমাল]

১১. কুতবা ইবনে আমীর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মক্কা বিজয়ের দিন বনু সালামা গোত্রের পতাকা ছিল। [তাবাকাতে ইবনে সাদ, আল-ইস্তিয়াব; ইবনে আব্দুল বার, আল-ইসাবা ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ]

ইমামগণ বলেছেন, উক্ত বিষয়টি বৈধ হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে মানুষ যখন তার গোত্রের মধ্যে থেকে লড়াই করে তখন তাদের সামনে শক্তি ও বীরত্ব প্রকাশ করতে হয়। তবে সে যদি নিজ গোত্র ছাড়া অন্য গোত্রের সাথে থেকে লড়াই করে তাহলে এমনটি করবে না। কেননা প্রতিটি ব্যক্তিই নিজ গোত্রের ভালো গুণাবলি প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং তাদের মধ্যকার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আলোচনা করা থেকে বিরত থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যে গোত্রগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের প্রতিটি গোত্রকেই তাঁদের আমীর এবং পতাকাসহ আলাদা আলাদা প্রেরণ করেছিলেন। হাদীস এবং জীবনী গ্রন্থগুলোতে তা বর্ণিত আছে। [নাইলুল অওতার, কাতার সাজানো, পরিচিত কোনো নিদর্শন দেয়া এবং আওয়াজ উঁচু করা অপছন্দনীয় অধ্যায়]

পরিশিষ্ট:

সুতরাং কোনো ব্যক্তি তার গোত্রের প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে দীনের খাদেম এবং সাহায্যকারী হবে। এটাই গোত্রপ্রীতির সঠিক অর্থ। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি সম্পৃক্ত করে এবং তাদের সাথেই অবস্থান করে এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এটি একদমই অতি মানবীয় ও বৈধ বিষয়। এবং এতে মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

অর্থ: "হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।" [সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩]

তবে এর সাথে লক্ষণীয় ও আবশ্য পালনীয় কর্তব্য হলো: এ গোত্র প্রীতি হতে হবে একমাত্র দীনের সাহায্যের জন্য এবং খেদমতের উদ্দেশ্যে;

যেমন কোনো ব্যক্তি মুসলমান এবং কাফেরদের সাথে চলমান কোনো যুদ্ধে নিজ গোত্রের পতাকাতলে থেকে লড়াই করল। কারণ মানুষের পরিবারবর্গ এবং নিকটের লোকেরাই তার সদাচার ও অনুগ্রহের অধিক হকদার। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের, নিজ পরিবারবর্গের এবং নিজ সম্প্রদায়ের কোনো উপকার করতে পারল না তাহলে সে কীভাবে অন্য লোকের উপকার করবে?

আমি হয়তো এই বিষয়ে অন্য কোনো মজলিসে আরো বিশদ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর দীনের সাথে সাংঘর্ষিক এই জাহেলী জাতীয়তাবাদের অসার দাবিগুলোর মুখোশ উন্মোচন করব। জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পৃক্ত, এমন বিষয়েও আলোকপাত করবো যা বর্তমান সময়ে মানুষের মাঝে মহামারী আকার ধারণ করেছে। আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, এর ভয়াল থাবা থেকে দীন শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত অনেক ব্যক্তিবর্গও রেহাই পায়নি।

আমরা আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে মেনে নিলাম, ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করলাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে মেনে নিলাম। আমরা আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আমীন।

দ্বিতীয় মজলিস

হামদ, সানার পর।

আলোচিত হাদীস নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছিল, সে ধারাবাহিকতায় এটা আমাদের দ্বিতীয় মজলিস।

আজকের আলোচ্য বিষয়

‘হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মর্যাদা ও কৃতিত্ব’

দীর্ঘ অবরোধের পরও খায়বারের দুর্গটি জয় করা যাচ্ছিল না। এদিকে সময়ের আবর্তে সাহাবীদের সাথে থাকা পাথেয়ও ফুরিয়ে আসছিল।

ঠিক সেই কঠিন মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন।

"رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله"

অর্থঃ “আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা তুলে দিব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা খায়বারের পতন ঘটাবেন; যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালবাসেন।” (সহীহ বুখারী - ২৯৪২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিলেন;

> আগামীকাল আল্লাহ তাআলা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মাধ্যমে খায়বারের বিজয় দান করবেন। আর পরবর্তীতে এমনটিই হয়েছে।
>
> হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন।
>
> আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁকে ভালোবাসেন।

উপরোল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো এমন যে, নিষ্ঠাবান প্রত্যেক মুসলিম-হৃদয় তা অর্জন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালন করে। এমন মর্যাদার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম সে রাতটি একটুও ঘুমাতে পারেনি। ভাবনা সবার, কে হবে সেই মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি? এ আলোচনা আর উৎকণ্ঠাতেই কেটে গেছে পুরো রাত।

আল্লাহর পক্ষ হতে কল্যাণ ও সুউচ্চ মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে সাহাবীদের প্রতিযোগিতা

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে;

"সাহাবীগণ সে রাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন।"

সাহাবীগণ কল্যাণ ও মর্যাদা লাভের প্রতি এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে খায়বার বিজেতার কথা শুনে সে রাতে তারা একটুও ঘুমাতে পারেনি। কে হবে সেই মহা সৌভাগ্যের অধিকারী? কে হবে সেই মর্যাদার অধিকারী, যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন- 'সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে আবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসে।

আলেমগণ বলেন, এই বিষয়টিও সাহাবীদের মর্যাদার একটি প্রমাণ যে, খায়বার বিজেতার সুউচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি শোনার পর, কে হবে সে মর্যাদার অধিকারী?— এ বিষয়ে আলোচনা করতে করতেই তাঁদের রাত ভোর হয়েছে। আর প্রত্যেকে এই সুমহান মর্যাদা লাভে এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে, সকাল হতে না হতেই সকলে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা লাভের আকাঙ্ক্ষা এতটাই তীব্র ছিল যে, খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ যেন তাঁরা ভুলেই গিয়েছিলেন। আর নেতৃত্ব অপছন্দ করা, নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকার মানসিকতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সেদিন মাথা উঁচিয়ে উঁচিয়ে রাসূলের সামনে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন, যেন তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হয় খায়বারের পতাকা।

يدوكون অর্থাৎ এ বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করছিলেন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করছিলেন।

ليلتهم এটা يدوكون এর যরফ হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা পুরো রাত আলোচনা করছিলেন।

أيُّهم يُعطاه এটা يدوكون থেকে হাল (অবস্থাবাচক) হিসেবে নসবের স্থানে রয়েছে। যেন তিনি বলতে চেয়েছেন; পতাকা কাকে দেওয়া হবে?— এ বিষয়ে পরস্পর আলোচনা, অনুমান, জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতেই তাঁরা রাত কাটিয়ে দিলেন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে;

"فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها"

অর্থঃ “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকা সাহাবায়ে কেরাম যখন সকালবেলা আগ্রহ নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন, তখন প্রত্যেকের মনেই এই আশা উঁকি দিচ্ছিলো, যেন পতাকাটি তাঁর হাতেই ন্যস্ত করা হয়”। (সহীহ বুখারী -৩৭০১)

غدوا অর্থাৎ সকাল সকাল গেল। এখানে তাড়াতাড়ি যাওয়ার অর্থ রয়েছে। এই শব্দের মাঝে তাঁদের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা, কল্যাণের প্রতি ব্যাকুলতা এবং কল্যাণ লাভের গুরুত্বারোপের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

كلهم يرجو أن يعطاها এখানে كل শব্দটি দ্বারা সকল সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে। সম্ভবত, এখানে আম শব্দটি দ্বারা খাস উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ‘প্রত্যেক সাহাবী’ বলতে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সামগ্রিকভাবে যারা এই সুমহান মর্যাদা লাভের অধিক উপযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সবাই উদ্দেশ্য। তাঁরা ছিলেন, নৈকট্য-প্রাপ্ত প্রথম সারির মুহাজির ও আনসার সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম (আল্লাহই ভালো জানেন)

প্রথম সারির সাহাবাদের মধ্যে যারা ছিলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও তাঁদের একজন। তিনি বলেন;

ما أَحْبَبْتُ الإمارَةَ إلّا يَومَئذٍ، قالَ: فَتَساوَرْتُ لَها رَجاءَ أَنْ أُدْعى لَها

অর্থঃ “খাইবারের সেই দিন ছাড়া জীবনে কোনোদিন আমি নেতৃত্ব কামনা করিনি। সেদিন আমি মাথা উঁচিয়ে উঁচিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজেকে পেশ করছিলাম এই আশায় যে, তিনি যেন আমাকেই মনোনীত করেন।” (সহীহ মুসলিম ২৪০৫)

বুরাইদা ইবনে হাসিব আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই বিশিষ্ট সাহাবীদের একজন, তিনি বলেন;

وأنا فيمَن تطاولَ لها

অর্থঃ "আমিও সেদিন অন্য সাহাবীদের সাথে মাথা উঁচিয়ে উঁচিয়ে রাসূলের সামনে নিজেকে পেশ করেছিলাম।" (মুসনাদে আহমাদ, ২২৯৯৩)

এখানে ফযীলত ও কল্যাণের প্রতি সাহাবাদের আগ্রহ ফুটে উঠেছে। নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের সামান্য আগ্রহ না থাকলেও এই বিরাট ফযীলত ও সুউচ্চ মর্যাদা সেদিন তাঁদের নেতৃত্ব কামনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, মর্যাদা তাকেই দান করেন:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন বললেন, "আলী কোথায়?" তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, "তিনি তো অসুস্থ, চোখ উঠেছে।" (সহীহ বুখারী - ৩৭০১)

অর্থাৎ, খায়বার বিজয়ের দিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিতই ছিলেন না। এমনকি খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ এবং বিজয়ের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন, তাও তিনি শোনেননি। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলা যাকে চান, তাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। কেননা যে সকল সাহাবী এ মহা সৌভাগ্য লাভের আশায় প্রবল আগ্রহ নিয়ে সকাল সকাল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের কেউই তা লাভ করেনি, আর যিনি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না শেষে তিনিই পেয়ে গেলেন।

তবে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য এমন আছে, যেগুলো আল্লাহ তাআলার নেয়ামত লাভের কারণ হয়। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর যেসব বান্দাকে সম্মানিত করতে চান তাদেরকেই এসব বৈশিষ্ট্য দান করেন। মূলত এমন কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সুমহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁর সৎকর্মপরায়ণতা, সবর, শোকর, অধিক যিকির ও কল্যাণের পথে অগ্রগামিতার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ মর্যাদার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে "তিনি মারাত্মকভাবে 'চোখ ওঠা' রোগে আক্রান্ত ছিলেন।"

বর্ণনাকারী বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীদেরকে তাঁকে ডেকে আনতে পাঠালেন। তাঁকে নিয়ে আসা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে নিজের থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। ফলে তিনি পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন ইতিপূর্বে তিনি এমন রোগে আক্রান্ত ছিলেনই না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় অসুস্থদের সুস্থতা দান করা, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য মোজেযার একটি।

فَبَرَأَ দ্বারা রোগ থেকে সুস্থ হওয়া বুঝানো হয়েছে। আর এটা বাবে فتح থেকে ব্যবহৃত হয়। এই মাদ্দায় বাবে سمع থেকেও অন্য একটি মাসদার রয়েছে, যা অধিকাংশ সময় الولاء। এর বিপরীতে ব্যবহার হয়।

পতাকা গ্রহণ ও লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়তা লাভ করা

পতাকা গ্রহণের পর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তারা আমাদের মতো হওয়া পর্যন্ত কি তাদের সাথে লড়াই করব?

হাদীসের এই অংশের ব্যাখ্যা: যখন শ্রেষ্ঠত্বের তিলক ও বিজয়ের সুসংবাদ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ললাটে লেগে গেল এবং তিনি যথাযথ দায়িত্বশীলতার সাথে পতাকা গ্রহণ করলেন, তখন চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা চাইলেন।

তাঁর প্রশ্ন ছিল: তারা আমাদের মতো হওয়া পর্যন্ত কি তাদের সাথে যুদ্ধ করব? অর্থাৎ আমাদের মতো মুসলিম হওয়া পর্যন্ত। এখানে 'আমাদের মতো' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এক হওয়া।

তাঁর প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য ছিল: তাদের সাথে কতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে, তা জানা। পাশাপাশি, এটাও জানা যে, তাদের থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে কিনা? অর্থাৎ তারা মুসলিম হওয়া পর্যন্ত লড়াই করা হবে, নাকি জিযিয়া বা অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে? (আল্লাহই ভালো জানেন)

এমন প্রশ্নের কি হিকমত!

প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্ভাব্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমি অনুসন্ধান করেছি।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্য কোনো প্রশ্ন না করে এ প্রশ্ন করার কারণ সম্পর্কে আমার কাছে মনে হয়েছে, এই যুদ্ধের সামরিক, রাজনৈতিক সাধারণ ও সুপ্রসিদ্ধ বিষয়গুলো সবার নিকটই স্পষ্ট ছিল। অন্যদিকে, মুসলিম বাহিনী দীর্ঘ দিন থেকেই দুর্গ অবরোধ করে প্রাণপণ লড়াই করার পরও কোনো ফলাফল আসছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বিজয়ের সুসংবাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি এ বিষয়েও নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে, কোন পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন, তাদের সাথে যুদ্ধের সীমারেখা কি হবে? আল্লাহ তাআলা আমাদের নিকট এতটুকু স্পষ্ট করেছেন। প্রকৃত বিষয় তো তিনিই ভালো জানেন।

অন্য একটি হিকমত: সহীহ মুসলিমসহ আরো কয়েকটি গ্রন্থের বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কীসের ভিত্তিতে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব?

তখন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তুমি তাদের সাথে লড়াই করো, তারা এই সাক্ষী দেওয়া পর্যন্ত যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এই সাক্ষী দেয়, তাহলে তারা তোমার থেকে নিজেদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নিল। যদি ইসলামের হকের ব্যাপারে কোনো বৈপরীত্য ঘটে তাহলে ভিন্ন কথা, আর তাদের হিসাব তো আল্লাহ তাআলারই নিকট।”

এই হাদীস থেকে বাহ্যত মনে হয় যে, তাদের থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না, বরং তারা মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন।

যদিও পরবর্তীতে অবস্থা এর বিপরীত হয়েছিল। দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর যখন পরাজয়ের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তখন তারা রাসূলের কথা মতো দুর্গ থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং তারা খায়বারে থাকার বিনিময়ে খায়বারের জমি চাষ করে এর একটা অংশ মুসলিমদের দেওয়ার শর্তে সন্ধিও করেছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হতবাক করা জবাব

(যিনি ছিলেন উম্মাহর নেতা, শিক্ষক এবং আদর্শ পুরুষ।)

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রশ্নের জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তুমি ধীরস্থিরভাবে তাদের দুর্গের দিকে এগিয়ে যাও, অতঃপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান কর। তাদের উপর আল্লাহ তাআলার কী কী হক রয়েছে, তা তাদের জানিয়ে দাও। কেননা আল্লাহর শপথ, আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজনকেও হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উট সাদাকার চেয়েও অধিক কল্যাণকর।”

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, “তুমি চলতে থাক, পিছনে ফিরে তাকিও না যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তোমার হাতে বিজয় দান করেন।” বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছু দূর গিয়ে থেমে গেলেন, কিন্তু পিছনে তাকালেন না। বরং চিৎকার করে বললেন, “হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কীসের ভিত্তিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করব?”

তখন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর তাআলার রাসূল। যদি তারা এ সাক্ষ্য দেয়, তবে তারা তোমার থেকে নিজেদের জান-মাল নিরাপদ করে নিল। যদি ইসলামের হকের ব্যাপারে কোনো বৈপরীত্য ঘটে তাহলে ভিন্ন কথা, আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব তো আল্লাহ তাআলারই নিকট।”

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যাও যুদ্ধ কর আল্লাহ তোমার হাতে বিজয় দান করা পর্যন্ত পিছনে ফিরে তাকিও না।” এরপর যখন কিছু দূর চলে গেলেন তখন পিছনে

ফেরাকে সমীচীন মনে করলেন না। তাই চিৎকার করে জানতে চাইলেন যে, তাদের সাথে কীসের ভিত্তিতে যুদ্ধ করবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যখন তারা তা বলবে তাদের রক্ত, সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তবে যদি তাদের উপর শরীয়তের কোনো হদ থাকে (তা ভিন্ন ব্যাপার)।"

সহীহাইনের অধিকাংশ বর্ণনায় انفذ على رسلك শব্দটি এসেছে। আমরা এখানে আরো কিছু শব্দ-পার্থক্য উল্লেখ করেছি, প্রকৃতপক্ষে ঘটনা একটাই। সুতরাং প্রত্যেকটি বর্ণনাকে ভিন্ন ভিন্ন বুঝার সুযোগ নেই। তবে এ ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা হলো, এই বর্ণনাটি রেওয়ায়েত বিল লফয তথা হুবহু বর্ণনা নয়। বরং রেওয়ায়েত বিল মানা তথা ভাবগত বর্ণনা। ফলে মূল বিষয় বস্তু ঠিক রেখে হাদীসটি সাহাবাদের একেকজন একেকভাবে মুখস্থ করেছেন।

শায়খ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহিমাহুল্লাহর কিতাব حجة الله البالغة থেকে একটি ফায়দা

তিনি বলেন: রেওয়ায়াত বিল মানার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের মূল লক্ষ থাকে হাদীসটির বিষয়বস্তু। এক্ষেত্রে আরবগণ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য যেসব বিষয় বিবেচনা করেন, সেগুলো এখানে মুখ্য বিষয় থাকে না। যেমন হাদীসে ف ব্যবহৃত হয়েছে না و , কোনো অংশ আগে এসেছে আর কোনো অংশ পরে এসেছে। কেননা অধিকাংশ সময় এমন ঘটে যে, একজন বর্ণনাকারী একটি ঘটনার একটি নির্দিষ্ট স্থানে ف বলেছেন আর অন্যজন সেই একই ঘটনায় ف এর স্থলে و ব্যবহার করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে বিশ্বাস রাখতে হবে, বর্ণনাকারী যা কিছু বর্ণনা করেন তার সবই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। তবে এর বিপরীতে যদি আরো শক্তিশালী হাদীস বা দলীল পাওয়া যায় তবে সে অনুযায়ীই আমল করতে হবে।

এই বিষয়টি উসূলে হাদীসের কিতাবসমূহের আলোচ্য বিষয়। বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা আলেমদের কিতাবে ও হাদীসের বিভিন্ন শরাহেও (ব্যাখ্যা গ্রন্থেও) পাওয়া যাবে।

এবার মূল বিষয়ে ফেরা যাক, ঘটনাটির সবগুলো বর্ণনা ও হাদীসের শব্দ থেকে বেশ কিছু হেকমত ও ফায়দা হাসিল হয়। সহজ কিছু ফায়দা ও হেকমত আমরা এখানে উল্লেখ করছি;

প্রথম হিকমত - انفذ এর সাথে على رسلك শব্দ বলা। (ধীরগামীতার সাথে চলতে থাক)

দ্বিতীয় হিকমত - ولا تلتفت বলা। (পিছনে ফিরে তাকাবে না)

তৃতীয় হিকমত - حتى تنزل بساحتهم বলা। (তাদের দুর্গে অবতরণ করা পর্যন্ত)

চতুর্থ হিকমত - ثم ادعهم إلى الإسلام বল অর্থাৎ (অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করো)

পঞ্চম হিকমত - وأخبرهم بما يجب عليهم বলা (তাদেরকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে জানাও)

ষষ্ঠ হিকমত - فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا বলা (আল্লাহর শপথ, আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজনকেও হেদায়াত দান করে)

আল্লাহর তাওফীকে ইনশাআল্লাহ আমরা সবার সামনে এই হিকমতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করব। আমরা শুধু তাঁরই উপর ভরসা করি, তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমাদের ভালো কাজ করার কোনো শক্তি নেই, খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকারও কোনো শক্তি নেই।

প্রথম হিকমত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: انفذ على رسلك

অন্যান্য বর্ণনায় রয়েছে سر ,امش ,اذهب আর انفذ শব্দটি এই সবগুলো অর্থ ধারণ করে, পাশাপাশি এটি দ্রুততা, অবিচলতা, নিঃসংকোচে লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলার অর্থও ধারণ করে। অর্থাৎ انفذ এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম যেন বলতে চেয়েছেন, তুমি কারো কথায় কান না দিয়ে অটলতা ও অবিচলতার সাথে এগিয়ে চল, যতক্ষণ না তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাও।

অর্থাৎ نفذ। শব্দটিতে দ্রুততা, কর্মতৎপরতা, অবিচলতা, অধ্যবসায়ের সাথে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়া ও অটলতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সম্ভবত, শব্দটি তীর ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহারের কারণে এসব অর্থ তৈরি হয়েছে।

বিখ্যাত শব্দ-গ্রন্থ মুখতারুস সিহায় রয়েছে:

(نفذ السهم من الرميَّة) – তীর লক্ষ্য ভেদ করল।

(نفذ الكتاب إلى فلان) – চিঠি অমুকের কাছে পৌঁছল।

باب نصر– نفوذا এর মাসদার, এটি نفاذا। ওজনেও ব্যবহার হয়।

(أَنفذه هو) – এটা সে বাস্তবায়ন করেছে।

(نفّذه) – সে বাস্তবায়ন করেছে।

أمر نافِذ – কার্যকরী নির্দেশ।

ইমাম রাগিব তাঁর আল-মুফরাদাতে বলেছেন:

نفذ السهم من الرميَّة- نفوذا,نفاذا – তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে চলে গেল।

نفذ المثقب في الخشب – ছিদ্রকারক যখন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছিদ্র করে ফেলে।

نفذ فلان في الأمر - نفاذا – অমুক ব্যক্তি বিষয়টি বাস্তবায়ন করেছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ

অর্থঃ “যদি তোমরা আসমান ও জমিনের সীমানা ভেদ করতে পার, তবে ভেদ কর।” (সূরা আর রহমান ৫৫:৩৩)

نفذت الأمر تنفيذا – আদেশটি বাস্তবায়ন করল।

نفذ الجيش في غزوه – বাহিনী যুদ্ধে অবতরণ করলো, হাদীসে এসেছে,

انفذوا جيش أسامة.

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম انفذ এর সাথে সাথে على رسلك ও বলেছেন। অর্থাৎ ধীরস্থিরতার সাথে। উদ্দেশ্য হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন: “তুমি তাদের নিকট ধীরস্থিরভাবে, অটল ও অবিচলভাবে যাও এবং তোমার কাজে তাড়াহুড়া কর না।”

অর্থাৎ على رسلك দ্বারা মূলত তাড়াহুড়া থেকে এবং ধীরস্থিরতার বিপরীত সকল কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। এটা ক্ষিপ্রতা ও দ্রুত চলাকে নাকচ করে না।

যেমন আল্লাহ তাআলা রহমানের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন,

الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

অর্থঃ “যারা বিনয়াবনত হয়ে জমিনে বিচরণ করে।” [সূরা ফুরকান ২৫:৬৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সিফাত হলো;

তিনি এমনভাবে দ্রুত হাঁটতেন, যেন উঁচু ভূমি থেকে নেমে আসছেন।

আবার আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।” [সূরা জুমআহ ৬২:০৯]

সারকথা হলো: এমনভাবে যাও যা গাম্ভীর্য ও ধীরস্থিরতারও বিপরীত নয়।

সুতরাং হাদীসের এই অংশ থেকে অসংখ্য কল্যাণকর হিকমত হাসিল হয় এবং এটাও বুঝা যায় যে , النفاذ في الأمر হলো ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততার সাথে চলা। কিন্তু এই ক্ষিপ্রতা তাড়াহুড়ার নয়। বরং তা হলো- পরিপূর্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে, ধীরস্থিরতা, কোমলতা ও উদ্যমতা গুণে গুণান্বিত হওয়া।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

الإسراع والعجلة শব্দ দুটি প্রায় সমার্থবোধক। কখনো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কখনো ভিন্ন ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং আল্লাহর আদেশ পালনার্থে দ্রুত এগিয়ে আসা, আমলের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া এবং কোনো প্রকার অলসতা ব্যতীত যথাসময়ে ইবাদতগুলো আদায় করা এটি একটি মহৎগুণ। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে অনেক নির্দেশনা এসেছে।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন;

"وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ"

অর্থঃ "এবং নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।" [সূরা আলে ইমরান ০৩:১৩৩]

তিনি আরো বলেন;

يُسَارِعُونَ فِي الخيرات

অর্থঃ "তারা উত্তম কাজের দিকে ধাবিত হয়।" [সূরা মুমিনুন ২৩:৬১]

তিনি আরো বলেন;

"إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"

অর্থঃ “জুমুআর দিন যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও।” [সূরা জুমআহ ৬২:০৯]

فاسعوا এখানে ‘ধাবিত হওয়া’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا"

“আঁধার রাতের মতো ফিতনাহ আসার পূর্বেই তোমরা সৎ আমালের দিকে ধাবিত হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে। বিকেলে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে বসবে।” (সহীহ মুসলিম -১১৮)

তিনি আরো বলেন,

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا الدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الأَرْضِ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَأَمْرَ الْعَامَّةِ وَخُوَيِّصَةَ أَحَدِكُمْ" .

“ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা নেক আমল করতে আরম্ভ কর। তা হলো দাজ্জাল, ধোঁয়া, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া ব্যাপক বিষয় (কিয়ামত) এবং খাস বিষয় (ব্যক্তির মৃত্যু)।” সহীহ মুসলিম -২৯৪৭

خُوَيِّصَة أحَدِكُم অর্থ মৃত্যু। أمر العامة হলো কিয়ামত। মুফাসসিরগণ এমনই বলেছেন।

তিনি আরো বলেন,

"لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ"

“যতদিন মানুষ বিলম্ব না করে ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।” [সহীহ বুখারী -১৯৫৭]

এখানে تعجيل الفطر অর্থ সূর্যাস্তের পর অবিলম্বে ইফতার করা।

অন্যদিকে কোনো ইবাদত পালনে বা দুনিয়াবি কোনো কাজে তাড়াহুড়া করা, অস্থির হয়ে যাওয়া কখনোই নন্দিত নয়, বরং তা সর্বদাই নিন্দিত। কেননা এসব ক্ষেত্রে স্থিরতা, কোমলতা, ধীরতা কাম্য। যেমন, নামাযের রোকনসমূহ দ্রুত আদায় করা, হাঁটা, কথাবার্তা, গল্পগুজব এবং মানব জীবনে দৈনন্দিন অন্যান্য কাজে তাড়াহুড়ো করা নিন্দনীয়। কেননা এ সকল কাজে সর্বদাই মধ্যমপন্থা, ধীরস্থিরতা কাম্য। তবে বিশেষ কোনো অবস্থায় দ্রুততার প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা।

সুতরাং তাড়াহুড়া অস্থিরতা সর্বদাই নিন্দনীয় বিষয়।

উলামায়ে কেরাম বলেন العجلة। এর অর্থ হলো কোনো কিছু তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পেতে চাওয়া।

আল্লামা রাগিব আসফাহানি রহিমাহুল্লাহু তাঁর আল-মুফরাদাত গ্রন্থে বলেন العجلة। বলা হয় সময়ের আগেই কোনো জিনিস পেতে চাওয়া বা বাস্তবায়ন করতে যাওয়া। আর এমনটি প্রবৃত্তির কারণে হয়ে থাকে। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় এটাকে মন্দ বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়, তাড়াহুড়া হয় শয়তানের পক্ষ হতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"سَأُوْرِيكُمْ اياتي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ"

অর্থঃ “আমি অচিরেই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ত্বরা চেও না।” [সূরা আম্বিয়া ২১:৩৭]

অন্য আয়াতে বলেন,

"وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ"

অর্থঃ “ওহীর মাধ্যমে যখন কুরআন নাযিল হয়, তখন তা শেষ হওয়ার আগে কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না।” [সূরা তহা ২০:১১৪]

অন্য আয়াতে বলেন,

وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَٰمُوسَىٰ

অর্থঃ “(মুসা আলাইহিস সালাম যখন সাথের লোকজনের আগেই তুর পাহাড়ে চলে আসলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন,) হে মুসা! তুমি তাড়াহুড়া করে তোমার সম্প্রদায়ের আগে আগে কেন আসলে?” [সূরা তহা ২০:৮৩]

অন্য আয়াতে বলেন,

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ

অর্থঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে তাড়াতাড়ি এসেছি এজন্য, যাতে আপনি খুশি হন।” [সূরা তহা ২০:৮৪]

উল্লেখিত আয়াতে মুসা আলাইহিস সালামের তাড়াহুড়া করাটা যদিও অগ্রহণীয় ছিল, তবে তার কারণ ছিল খুবই প্রশংসনীয়। আর তাহলো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ।

অন্য আয়াতে বলেন,

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

অর্থঃ “আল্লাহর হুকুম এসে গেছে। কাজেই তার জন্য তড়িৎ প্রবণ হয়ো না।” [সূরা নাহল ১৬:০১]

অন্য আয়াতে বলেন

وَيَسْتعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

অর্থঃ “তারা ভালো অবস্থার (কাল শেষ হওয়ার) আগে মন্দ অবস্থার জন্য তাড়াহুড়া করছে।” [সূরা রাদ ১৩:০৬]

অন্য আয়াতে বলেন,

لِمَ تستعجلون بِالسَّيِّئَةِ قبل الْحَسَنَة

অর্থঃ “তোমরা ভালোর আগে মন্দকে কেন তাড়াতাড়ি চাচ্ছো?”]সূরা নামল ২৭:৪৬]

অন্য আয়াতে বলেন,

ويستعجلون بِالْعَذَاب

অর্থঃ “তারা আপনাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি এনে দিতে বলে।” [সূরা হজ ২২:৪৭]

অন্য আয়াতে বলেন,

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ

অর্থঃ “আল্লাহ যদি মানুষের (অর্থাৎ ওইসব কাফেরের) জন্য অনিষ্টকে (অর্থাৎ শাস্তিকে) ত্বরান্বিত করতেন, যেমনটা ত্বরা কল্যাণ প্রার্থনার ক্ষেত্রে তারা করে থাকে।” [সূরা ইউনুস ১০:১১]

অন্য আয়াতে বলেন,

خُلِقَ الانسان مِنْ عَجَلٍ

“মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্বরাপ্রবণ করে।” [সূরা আম্বিয়া ২১:৩৭]

কেউ কেউ বলেছেন এখানে عجل দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে حمإ অর্থাৎ ক্ষিপ্রতা ও ক্রুদ্ধতা। আয়াতে কারিমা এদিকে ইশারা করছে যে, মানুষকে এই অভ্যাস দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই সে কখনো এ অভ্যাস থেকে মুক্ত হবে না। অন্য একটি আয়াতেও এমনটি বলা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَانَ الانسان عَجُولًا

অর্থঃ “বস্তুত মানুষ বড় তড়িৎ প্রবণ।” [সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:১১]

আর ইমাম রাগিব আসফাহানির দাবি العجلة من الشيطان। এটি হাদীসের শব্দ, যার আলোচনা আমরা সামনে করব, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُم এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, العجلة বলা হয় কোনো কাজ তার নির্ধারিত সময় হওয়ার পূর্বেই করা। আর তা

নিন্দনীয় এবং السرعة হচ্ছে কোনো কাজ তার নির্ধারিত সময়ের শুরু ভাগে করা আর এটি প্রশংসিত।

সুতরাং বুঝা গেল দ্রুততা মানুষের স্বভাবজাত।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَكَانَ الانسان عَجُولًا

অর্থঃ “বস্তুত মানুষ বড় তড়িৎ প্রবণ।” [সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:১১]

خُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ مِنْ عَجَلٍ

অর্থঃ “মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্বরাপ্রবণ করে।” [সূরা আম্বিয়া ২১:৩৭]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তা দ্বারা পরীক্ষা করেন এবং আল্লাহ বান্দাকে তার নির্দেশ পালনে অবিচলতার ক্ষেত্রে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যাকেই আল্লাহ তাওফীক দান করবে এবং নফসের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করবে সেই পরীক্ষায় সফল হবে।

কখনো কখনো التعجيل শব্দটি الإسراع এর স্থানেও ব্যবহৃত হয়। এরকম একটা লফয অন্য লফযের স্থানে ব্যবহার হতে পারে। আরবীতে এর অবকাশ আছে।

যেমন আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّونَ فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبَنَا"

অর্থঃ “আবু বকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম, ইত্যবসরে সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি তাড়াহুড়ার কারণে নিজের চাদর টানতে টানতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন, অন্যান্য মানুষ তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তিনি দুই

রাকআত সালাত আদায় করলেন, যেমন অন্যরা আদায় করে থাকে। যখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল তিনি আমাদের খুতবা দিলেন।" (সুনানে নাসায়ী -১৫০১)

সুতরাং এখানে العجلة দ্বারা তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্য।

আরেকটি উদাহরণ হলো, জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি বলেন,

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت [أي غربت أي الشمس]، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجّل؛كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس "

অর্থঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আর আসরের সালাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আদায় করতেন, মাগরিবের সালাত সূর্য অস্ত যেতেই আর ইশার সালাত কখনো বিলম্বে আদায় করতেন কখনো তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। যদি দেখতেন, সকলেই সমবেত হয়েছেন, তাহলে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। আর যদি দেখতেন, লোকজন আসতে দেরি করছে, তাহলে বিলম্বে আদায় করতেন। আর ফজরের সালাত তাঁরা কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকার থাকতে আদায় করতেন।" (সহীহ মুসলিম-৬৪৬)

অন্য হাদীসে এসেছে;

"إذا وُضِعَ عشاءُ أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه"

অর্থঃ "যখন তোমাদের কারো সামনে খাবার উপস্থিত থাকে, এদিকে জামাত দাঁড়িয়ে যায়। তাহলে সে যেন তাড়াহুড়ো না করে, বরং খাবার শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে।" [সহীহ বুখারী -৬৭৩]

এটি সহীহ বুখারীর শব্দ। বুখারীর অন্য হাদীসে ভিন্ন শব্দেও এমন রেওয়ায়েত এসেছে, আর তা হলো:

"إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة"

অর্থঃ "যদি তোমাদের কেউ খানা খেতে থাকে, তাহলে সে যেন তাড়াহুড়ো করে জামাতে শরীক না হয়; যদিও জামাত দাঁড়িয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে যদি নামায দাঁড়ানোর সময় খাবার উপস্থিত থাকতো, তাহলে তিনি খাবার না শেষ করে নামাযে আসতেন না। যদিও তিনি ইমামের কেরাত শুনতে পেতেন।" (সহীহ বুখারী -৬৭৪)

আমাদের উক্ত আলোচনা বুঝার জন্য উলামায়ে কেরামের কিতাবাদি অধ্যয়ন করা যেতে পারে, যা পাঠকের জন্য সহায়ক হবে।

মুহম্মাদ বিন ইসমাইল আস সানআনী রহিমাহুল্লাহ سبل السلام (সুবুলুস সালাম) কিতাবে বলেছেন;

العجلة এর অর্থ হলো কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা। সুতরাং যে বিষয়ে ধীরতা কাম্য সে বিষয়ের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো নিন্দনীয়। আর কল্যাণ কাজের দিকে, সে ক্ষেত্রে দ্রুত ধাবিত হওয়া কাম্য, যেখানে দ্রুততা প্রশংসাযোগ্য বিষয়।

তবে কেউ কেউ বলেন, الأناة (ধীরতা) এবং المسارعة(দ্রুত ধাবিত হওয়া) এ শব্দ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা স্থিরচিত্তে, সুষ্ঠুভাবে কোনো কাজে দ্রুত ধাবিত হওয়া সম্ভব। তবে প্রতিটি কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাটাই শ্রেয়।

আল্লামা মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ تحفة الأحوذي 'তুহফাতুল আহওয়াজী' নামক কিতাবে মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেন,

"ইবাদতের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া এবং কোনো ইবাদতকে তাড়াহুড়া করে আদায় করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি প্রশংসনীয় আর দ্বিতীয়টি নিন্দনীয়।"

উল্লেখিত উদাহরণগুলোতে আমরা দেখতে পাই, যে কাজ তাড়াতাড়ি করা, দ্রুত করা, আগে আগে করা নিন্দনীয় সেটার ক্ষেত্রেই العجلة শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই শব্দটির ব্যবহার নিন্দনীয় কাজের ক্ষেত্রেই ভাষাবিদদের নিকট বেশি প্রচলিত। এমনকি কুরআনের যত জায়গায় الاستعجال শব্দটি এসেছে সেটা হয়তো নিন্দনীয় বা দোষণীয় কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা মুশরিকদের ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

উলামায়ে কেরামের একটি মূলনীতি হলো: যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কোনো কাজ করবে, সে ঐ কাজ করেনি বলে বিবেচিত হবে এবং এর জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এই মূলনীতির উপর তাদের নিকট একাধিক দলীল ও অনেক উদাহরণ রয়েছে। আর বাস্তব জীবনেও এই মূলনীতিটিই বেশি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস শরীফে তাড়াহুড়াকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। যেমন আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"الأناة من الله والعجلة من الشيطان"

অর্থঃ "ধীরস্থিরভাবে কাজ করা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়া করে কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।" [সুনানে তিরমিযী - ২০১২] (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু শাইবা, আবু ইয়ালা সহ অন্যরা বর্ণনা করেছেন।) তবে এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ কিছু বক্তব্য রয়েছে।

সহীহাইনেও আলোচিত দ্রুততার নিন্দার উপর আরো কয়েকটি হাদীস এসেছে,

যেমন হাদীসে বলা হয়েছে,

"يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؛ يقول دعوتُ فلم يستجب لي"

অর্থঃ "তোমাদের প্রত্যেকের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়া না করে। আর বলে যে, আমি দোয়া করলাম কিন্তু আমার দোয়া তো কবুল হলো না।" [সহীহ বুখারী -৬৩৪০]

এখানে العجلة শব্দের অর্থ হলো অধৈর্য হয়ে পড়া এবং নিরাশ হয়ে দোয়া ছেড়ে দেওয়া। আর এখান থেকে অনেক বদ ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সহীহ মুসলিমসহ অন্য বর্ণনায় এসেছে,

"لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أو قطيعةِ رحم ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول: قد دعوتُ وقد دعوت فلم أرَ يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء"

অর্থঃ "বান্দার দোয়া হরহামেশা কবুল করা হয় যদি না সে পাপ কর্মের জন্য কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দোয়া করে এবং (দোয়ায়) তাড়াহুড়া করে। বলা হলো, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! (দোয়ায়) তাড়াহুড়া করা কি?" তিনি বললেন, "সে বলতে থাকে, আমি দোয়া তো করেছি, আমি দোয়া তো করেছি; কিন্তু তা কবুল হলো বলে দেখতে পেলাম না। তখন সে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়।" [সহীহ মুসলিম -২৭৩৫]

উলামায়ে কেরাম এখানে يستحسر এর অর্থ করেছেন নিরাশ হয়ে দোয়া ছেড়ে দেওয়া, যেন সে দোয়া করে অনুগ্রহ করেছে। তার দোয়া কবুল হবে না এমন মন্দ ধারণা করতে থাকে, ফলে সে দোয়া কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'রূহ' নামক কিতাবে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ও শিক্ষামূলক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই কিতাবটি প্রত্যেক মুসলিমকেই পড়া উচিত। সেখানে তাড়াহুড়ার ফায়দা ও খারাবী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

المبادرة ও العجلة মাঝে পার্থক্য হলো, المبادرة হলো সিংহের ন্যায় সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, যেন শিকার হাত ছাড়া না হয়। কোনো কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও না করা এবং পরেও না করা। যেমন, গাছ থেকে ফল ভালোভাবে পরিপক্ক হওয়ার পর পাড়া।

العجلة এর অর্থ হলো; অতিরিক্ত লোভের কারণে সময়ের পূর্বেই কাজ করে ফেলা। ফল ভালোভাবে পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই পাড়া। সুতরাং المبادرة বলা হয় অবহেলার কারণে যেমনিভাবে কোনো কিছু নষ্ট না করা, ঠিক তেমনিভাবে সময়ের পূর্বেই কোনো কিছু না চাওয়া। আর অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো ব্যক্তির মাঝে এক

ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করে, ফলে সে অধৈর্য হয়ে নির্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কোনো ধরনের বাছ-বিচার না করে বিভিন্ন মন্দ কাজে জড়িয়ে যায়। পরিশেষে তাকে লজ্জিত হতে হয়। কেননা তাড়াহুড়া কখনোই ব্যক্তির জন্য সফলতা বয়ে আনে না, অন্যদিকে অলসতার কারণে সবকিছু হাতছাড়া হয়ে যায়।

প্রত্যেক কাজেই প্রয়োজন প্রজ্ঞা, ধীরস্থিরতা, ধৈর্য ও স্থিরতা

সহীহ মুসলিমসহ আরো অনেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-আশাজ্জ আব্দুল কাইসকে বলেছেন,

"إنّ فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلمُ والأناةُ"

অর্থঃ "তোমার মাঝে দুটি গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন। তা হলো, প্রজ্ঞা ও ধীরস্থিরতা।" (সহীহ মুসলিম -১৭)

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, الحلم হলো বিবেক আর الأناة হলো স্থির থাকা, তাড়াহুড়ো না করা।

আল-আশাজ্জ আব্দুল কাইসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা বলার উদ্দেশ্য প্রতিনিধি দলের (ওয়াফদে আব্দুল কাইস) হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

হাদীসে এসেছে,

انهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم

نعم فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه قال صدقت إنّ فيك خصلتين

অর্থ: "যখন তারা মদীনায় আসে, তখন সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে দ্রুত ছুটে যায়। কিন্তু আল-আশাজ্জ তাদের সামানপত্রের নিকট দাঁড়িয়ে থাকে। সেগুলোকে একত্রিত করে তাঁর উটনীকে শক্ত করে বাধে। অতঃপর উত্তম কাপড় পরিধান করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাছে নিয়ে বসান এবং গোত্রের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে বলেন: তোমরা কি নিজেদের এবং তোমাদের গোত্রের পক্ষ থেকে বাইয়াত নিবে? তারা বললো: হাঁ, তখন আশাজ্জ বলেন: "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কোনো লোককে তার দীনের চেয়ে কঠিন বিষয় থেকে সরিয়ে দেননি। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে বাইয়াত নিবো আর এমন একদল লোক পাঠাবো যারা গোত্রের লোকদেরকে দাওয়াত দিবে। সুতরাং যে আমাদের অনুসরণ করবে সে আমাদেরই একজন। আর যে অস্বীকার করবে আমরা তার সাথে লড়াই করব।"" তখন তিনি বলেন, "তুমি সত্য বলেছো। তোমার মাঝে দুটি গুণ রয়েছে- (যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন। তা হলো, প্রজ্ঞা ও ধীরস্থিরতা)।"

কাজী ইয়ায বলেন, الأناة হচ্ছে কোনো একটি জিনিসের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে তার জন্য প্রতীক্ষা করা এবং তা পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করা। আর الحلم হচ্ছে কোনো জিনিসের পরিণতির বিষয়ে সঠিক বুঝ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া।

সুনানে আবু দাউদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এমন এক ব্যক্তি থেকে যে আব্দুল কাইসের প্রতিনিধি দলের একজন ছিলেন। তিনি বলেন,

"لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنُقبِّل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله قال وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته [أي حقيبته] فلبس ثوبيه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له "إنّ فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة" قال: يا رسول الله! "أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما. قال: "بل الله جبلك عليهما" قال: الحمد الله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله.

অর্থঃ "আমরা মদীনায় এসে আমাদের বাহন থেকে দ্রুত নেমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ও পায়ে চুমু দিলাম।" তিনি বলেন,

“অন্যদিকে আল-মুনযির আল-আশাজ্জ তাঁর কাপড়ের বাণ্ডিল থেকে কাপড় বের করে তা পরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, “তোমার মধ্যে দুটি উত্তম স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন, ধৈর্য ও ধীর স্থিরতা।” তিনি বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এ অভ্যাস গড়ে তুলেছি, না আল্লাহ আমাকে এ দুটি অভ্যাসের উপর সৃষ্টি করেছেন?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আল্লাহই তোমাকে এ দুটি স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন।” তখন তিনি বললেন: “কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এমন দুটি স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন, যাকে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।” (সুনানে আবু দাউদ -৫২২৫)

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন

"إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" متفق عليه.

অর্থঃ “যখন তোমরা ইকামত শোনো তখন সালাতের দিকে গাম্ভীর্য ও ধীর-স্থিরতার সাথে আসো। যে রাকাতগুলো পাবে তা জামাতের সাথে আদায় কর। আর ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো নিজেরা একাকীভাবে আদায় কর।” (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال "فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"

অর্থঃ “একবার আমরা রাসূলের সাথে সালাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি কিছু লোকের হইচই শুনলেন। যখন নামায শেষ করলেন, তখন তাদেরকে বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, আমরা তাড়া-হুড়ো করে জামাতে উপস্থিত হয়েছি। তখন তিনি তাদের বললেন, “তোমরা সামনে থেকে এরকম করো না।

যখন নামাযে আসবে তখন ধীরস্থিরভাবে আসবে। তারপর যে কয় রাকাত পাবে সেগুলো জামাতের সাথে আদায় করবে আর ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো নিজেরা একা আদায় করবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

"كان صلى الله عليه وسلم في الحج يقول للناس: السَّكينةَ السَّكينة".

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের সময় মানুষদেরকে বলতেন, “তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো, তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো।”

তিনি একবার আরাফার দিন একটি দলের প্রচুর হট্টগোল, পিটাপিটি ও উটের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি তাদেরকে চাবুকের মাধ্যমে ইশারা দিয়ে বললেন, “হে লোক সকল! তোমরা ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করো। কেননা দ্রুত হাঁটার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।”

এখানে الإيضاع। দ্বারা দ্রুত হাঁটা উদ্দেশ্য।

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “এই হাদীসে শুধু আরাফার রাতে হাঁটার আদব বলা হয়নি। বরং ভীড় হয় এমন প্রত্যেক স্থানে হাঁটার আদব বলা হয়েছে।”

"كان صلى الله عليه وسلم في حجته يسيرُ العنق [وهو سيرٌ متوسط] فإذا وجدَ فجوة نصَّ"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় মধ্যম গতিতে হাঁটতেন। তবে জায়গা প্রশস্ত হলে দ্রুতও হাঁটতেন।

ইমাম সিন্দি রহিমাহুল্লাহ বলেন يسيرُ العنق দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন মধ্যম গতিতে হাঁটা, যা পর্যায়ক্রমে দ্রুততার দিকে ঝুঁকে আর فجوة অর্থ: হলো দুটি জিনিসের মাঝে প্রশস্ত জায়গা। نصَّ অর্থ : হচ্ছে উটনীকে এমনভাবে টানা যেন সে বড় কদম ফেলে দ্রুত চলতে পারে।

সুতরাং বোঝা গেল, উপযুক্ত স্থানে দ্রুততা অবলম্বন করা নিন্দনীয় নয়। আর প্রতিটি জিনিস তার যথাস্থানে রাখার মাঝেই কল্যাণ ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে।

আর السكينة শব্দটিالسكون মাসদার থেকে فعيلة ওজনে এসেছে। অর্থ- প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যতা। আর এটি হলো আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন এবং এর দ্বারা সম্মানিত করেন। এর মাধ্যমে তিনি আপন বান্দাকে সাহায্য করেন এবং সরল পথে অটল রাখেন।

যেমন তিনি বলেন,

هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ السَّکِیۡنَۃَ فِیۡ قُلُوۡبِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ لِیَزۡدَادُوۡۤا اِیۡمَانًا مَّعَ اِیۡمَانِہِمۡ ؕ وَلِلّٰہِ جُنُوۡدُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَکَانَ اللّٰہُ عَلِیۡمًا حَکِیۡمًا ۙ

অর্থঃ "তিনিই মুমিনদের দিলে প্রশান্তি নাযিল করেন যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বাড়িয়ে নেয়। আসমান ও জমিনের যাবতীয় বাহিনী আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ফাতহ ৪৮:০৪]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ছয়বার সাকিনার কথা উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ এর مدارج السالكين কিতাবের সাকিনাহ সংক্রান্ত আলোচনাটি দেখে নেয়া যেতে পারে।

সেখানে তিনি বলেছেন, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ কঠিন বিপদের সময় সাকিনার আয়াতগুলো পাঠ করতেন। আর আমি তাঁকে তাঁর অসুস্থতার সময় তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া এক দুর্দান্ত ঘটনার কথা বলতে শুনেছি। তখন তিনি শারীরিক দুর্বলতার কারণে জিন শয়তানের সাথে লড়াই করতে পারছিলেন না।

তিনি বলেন যখন পেরেশানী আরো বেড়ে গেল, তখন আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের সাকিনার আয়াতগুলো পাঠ করতে বললাম। তিনি বলেন, তারপর ঐ অবস্থা কেটে গেল এবং পেরেশানিও দূর হলো।

আর আমিও এ সকল আয়াত বিপদের সময় পাঠ করে অনেক উপকার পেয়েছি। আর বাস্তবেও অন্তরের প্রশান্তি ও স্থিরতার ক্ষেত্রে আয়াতগুলোর অনেক প্রভাব রয়েছে।

সাকিনার মূল অর্থ হচ্ছে, প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যতা। অধিক ভয়ের সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার অন্তরে সাকিনাহ নাযিল করার মাধ্যমে তাকে প্রশান্ত করেন। যা তার ঈমান, ইয়াকীন ও দৃঢ়তাকে বৃদ্ধি করে।

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে,

"ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده"

অর্থঃ “যে কোনো সম্প্রদায় যদি আল্লাহর ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে ও একে অপরকে তা শিক্ষা দেয়, তখন তাদের উপর সাকিনাহ নাযিল হয়, রহমত তাদের ঘিরে ফেলে এবং ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে নেন। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তার কাছে থাকা ফেরেশতাদের মজলিসে স্মরণ করতে থাকেন।” (সহীহ মুসলিম -২৬৯৯)

الحزم ও الجد অর্থ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর انفذ। শব্দটি কোনো বিষয়ে চেষ্টার কথা বোঝায় অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি পাওয়ার আশায় অম্লান বদনে চেষ্টা করা। পূর্বে এমনটিই বলা হয়েছে।

الجد। শব্দটি ঠাট্টা, তামাশা, বিলম্ব, শিথিলতা ও অপচয়ের বিপরীত শব্দ।

আর এটি الحزم। এর কাছাকাছি। আর الحزم। অপচয় ও অবহেলার বিপরীত।

সুতরাং الجد। ও الحزم। একত্রে বলা হয় এমন একটি গুণকে যা দুর্বলতা, অক্ষমতা ও লাঞ্ছনার বিপরীত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَه عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُه فُرُطًا

অর্থঃ “তুমি তার আনুগত্য কর না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ হতে উদাসীন করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য করে আর যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমালঙ্ঘনমূলক।” [সূরা কাহফ ১৮:২৮]

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থঃ “তোমরা হীনবল ও দুঃখিত হয়ো না, বস্তুত তোমরাই জয়ী থাকবে যদি তোমরা মুমিন হও।” [সূরা আলে ইমরান ০৩:১৩৯]

আমাদের মাঝে এমন কিছু মন্দ স্বভাব রয়েছে যেগুলো থেকে আমাদের বেঁচে থাকা এবং যেগুলোর বিপরীত স্বভাবগুলো থেকেও বেঁচে থাকা আমাদের উপর আবশ্যক। যাকে বলা যায় اللامبالاة ; যেমন অবহেলা, বিচক্ষণতার কমতি এবং কম মুহাসাবা করা।

اللامبالاة হলো কোনো বিষয়কে হীন করে দেখা, অসতর্ক থাকা, নিজের যোগ্যতাকে কাজে না লাগানো, সহজ উপায়-উপকরণ গ্রহণ না করা এবং এক কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার বিপরীত “তুমি তোমার উপকারী জিনিসগুলোর দিকে সবসময় গুরুত্বারোপ করো।”

অবহেলা, বিচক্ষণতার কমতির উদাহারণ, অনেক দায়িত্বশীল (চাই তা যত ছোট দায়িত্বই হোক না কেন- পরিবারের পিতা কিংবা ছাত্রদের শিক্ষক অথবা প্রজাদের দায়িত্বশীল কিংবা অন্য কিছু) যারা তাদের অধীনদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সঠিক ব্যবস্থা করে না, তাদের নিয়ে দীর্ঘ কোনো পরিকল্পনা করে না। তারা কোনো ভুল করলে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করে না, তাদেরকে সতর্ক করে না। ফলে ছোটবেলায় তারা যে ভুল করে, বড় হয়ে সেই একই ভুল আবার করে। বরং একই ভুল বার বার হতে থাকে। কিন্তু তা থেকে কেউ কোনো শিক্ষা নেয় না। যেন কোনো ভুলই হয়নি।

আর কম মুহাসাবা তথা আত্মজিজ্ঞাসা করা তো এক মারাত্মক ব্যাধি এবং অন্য অনেক ভুলের কারণ ।

যে ব্যক্তি বার বার ভুল করে, কিন্তু তা থেকে কোনো শিক্ষা নেয় না এবং যে ব্যক্তি নিজের কোনো মুহাসাবা করে না, চাই সে একক ব্যক্তি হোক কিংবা কোনো দল, তারা কখনোই সফল হতে পারবে না, ব্যর্থতাই তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী।

আল্লাহ তাআলার সাহায্যে আমরা সামনের মজলিসে এবিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় মজলিস

الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله محمد واله وصحبه وجنده

হামদ সানার (আল্লাহর প্রশংসা) এবং নবীজীর উপর দরূদ পাঠ করার পর...

আমাদের ধারাবাহিক আলোচনার এটি তৃতীয় মজলিস। আমরা পূর্ব থেকেই তাড়াহুড়া, দ্রুততা এবং তদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আসছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় সামনের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

ফায়দা:

আল্লাহ তাআলা বলেন;

وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى

অর্থঃ “এবং (মুসা যখন সঙ্গের লোকজনের আগেই তুর পাহাড়ে চলে আসলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন,) হে মুসা! আপনি তাড়াহুড়া করে আপনার সম্প্রদায়ের আগে আগে কেন আসলেন? তিনি বললেন; ওই তো তারা আমার পিছনেই আসল বলে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে তাড়াতাড়ি এসেছি এজন্য, যাতে আপনি খুশি হন।” **[সূরা তহা: ২০:৮৩-৮৫]**

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরে কেরামের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে; আয়াতটি মূলত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি একটি সতর্কতা মূলক প্রশ্ন। তাঁর সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে, তাড়াহুড়ো করে আল্লাহর কাছে চলে আসার কারণে তিনি এর সম্মুখীন হয়েছেন। কেননা মুসা আলাইহিস সালাম তাদের সাথে থাকা এবং তাদেরকে একসাথে উপস্থিত করার ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন।

মূল ঘটনাটি হচ্ছে: আল্লাহ তাআলা যখন মুসা আলাইহি সালামকে ৩০ দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন তিনি আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য নির্বাচিত ৭০ জন লোকসহ প্রতিশ্রুত দিনে তুর পাহাড়ের কাছাকাছি আসলেন। এক্ষেত্রে মুসা আলাইহিস সালাম ভাবলেন যে, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং তাঁর

প্রতি ভালোবাসার জানান দিতে নিজ সম্প্রদায়ের আগেই আল্লাহর কাছে ছুটে আসবেন। এ কারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ভর্ৎসনার সম্মুখীন হলেন। আল্লাহু আলাম।

বিশিষ্ট তাফসীর গ্রন্থ কুরতুবীতে রয়েছে, হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা সবকিছুই জানতেন, তারপরও মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নিম্নোক্ত কথা বলার কি কারণ থাকতে পারে?

আল্লাহ তাআলা বলেন;

“এবং (মুসা যখন সঙ্গের লোকজনের আগেই তুর পাহাড়ে চলে আসলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন,) হে মুসা! আপনি তাড়াহুড়া করে আপনার সম্প্রদায়ের আগে আগে কেন আসলে?”

উত্তর: আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে এমন প্রশ্ন করেছেন, তাঁর প্রতি দয়া ও সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর অন্তরকে শীতল করার জন্য এবং তাঁর প্রতি কোমলতা প্রকাশ করার জন্য। তখন তিনি তাঁর রবকে প্রতিউত্তর দিয়ে বললেন: “তারা তো আমার পিছনেই রয়েছে, আর আমি আপনার কাছে আগে এসেছি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। অর্থাৎ আমি ওই স্থানে দ্রুত ছুটে আসলাম যেখানে আসার জন্য আপনি আমাকে আদেশ করেছেন, আমি তা একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই করেছি।”

আরবীতে عجلة শব্দটি কয়েকটি ব্যবহার হলো এমন:

وعجول وعجلان، بين العجلة رجل عجل وعجل

যেগুলোর অর্থ হলো, তড়িৎ লোক, ক্ষিপ্র-গতিসম্পন্ন,তাড়াহুড়াকারী দ্রুতগতিসম্পন্ন ইত্যাদি। عجلة ‘তাড়াহুড়া’ শব্দটি بطء ‘ধীরগামী’ শব্দের বিপরীত।

তাফসীরে বায়যাবীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে,

উক্ত আয়াতটিতে তাড়াহুড়ার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলেও সেখানে আরো দুটি দাবি রয়েছে। এক. প্রশ্নটি অস্বীকার বাচক, তথা আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস

সালামের এ তাড়াহুড়াকে পছন্দ করেননি। দুই. মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাঁর সম্প্রদায়ের বিষয়ে গাফলতের দাবি। যার ফলে মুসা আলাইহিস সালাম উভয় বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন এবং ইনকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে আগে বলেছেন। আল্লাহ তাআলার প্রশ্নের উত্তরে মুসা আলাইহিস সালামের কথার সারসংক্ষেপ এমন: এইতো তারা আমার পিছনে আসছে, অর্থাৎ আমি তাদেরকে সামান্য দূরত্বের ব্যবধানে পিছনে রেখে এসেছি, যেটা স্বাভাবিকভাবে বিবেচনা করা হয় না; আমার মাঝে এবং তাদের মাঝে কেবল সামান্য দূরত্ব। যে ব্যবধান সাধারণত এক সফরসঙ্গী থেকে অন্য সফরসঙ্গীর মাঝে হয়ে থাকে। আর আমি আপনার কাছে তাড়াহুড়া করে এসেছি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। কেননা আপনার আদেশ পালন করতে তড়িৎ বেগে ছুটে আসা এবং আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা তো কেবল আপনার সন্তুষ্টিকেই আবশ্যক করে।

আল্লামা আলুসি রহিমাহুল্লাহ কতক উলামায়ে কেরামের সূত্রে বর্ণনা করেন,

মুসা আলাইহিস সালামকে তাড়াহুড়ার বিষয়ে প্রশ্ন করার কারণ হচ্ছে: তাঁকে সফরের আদব শিক্ষা দেয়া। কেননা সফরের আদব হচ্ছে, কাফেলা-প্রধান কাফেলার পিছনে থাকবে যাতে তিনি তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারেন এবং তাদের দেখভাল করতে পারেন। কিন্তু দল থেকে এগিয়ে গেলে তা আর অর্জিত হয় না। আয়াতের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহ তাআলা লুত আলাইহিস সালামকে আদব শিক্ষা দিয়ে বলেন, তুমি তাদের পিছন দিক অনুসরণ করো। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাদের পিছনে থাকার আদেশ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই ভালো জানেন।

আলুসি রহিমাহুল্লাহ উলামায়ে কেরাম থেকে অন্য একটি ব্যাখ্যাও উল্লেখ করেছেন। সেটি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। তিনি বলেন, এখানে আয়াতের মাঝে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অপছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে, মুসা আলাইহিস সালাম সত্তাগতভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর কাছে চলে আসা। দ্রুত আসা অপছন্দের মূল কারণ নয়। কারণ তিনি তাদের সাথে থেকে তাদেরকে নিয়েই আসার বিষয়ে আদিষ্ট ছিলেন। যেভাবে আমরা পূর্বে জেনে এসেছি- এখানে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাড়াহুড়াকে অপছন্দ করা কেবল একটি উসিলা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন; তাই মুসা আলাইহিস সালাম মূল বিষয়কে

সামনে রেখে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন যে, আমি ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুল করেছি এবং ধারণা করেছি যে, কাফেলা থেকে সামান্য পরিমাণে এগিয়ে যাওয়া সঙ্গদানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না এবং সেটাকে একাকী চলা কিংবা সঙ্গ না দেয়াও ধরা হবে না। তবে এই কাজ করতে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি, কেবল আপনার সন্তুষ্টির নীরবচ্ছিন্নতা এবং আপনার আদেশের প্রতি ছুটে চলার জন্যই। ফলে তিনি পরবর্তীতে বলেছেন, এইতো তারা আমার পিছনেই রয়েছে। এবং "আমি আপনার প্রতি দ্রুতপদে ছুটে এসেছি যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন" উক্ত আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতেরই সম্পূরক।

এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে; এখানে তাড়াহুড়া করার অপছন্দনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সেটা আমাদের পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকৃত অর্থে ধরা হবে। এর আরেকটি কারণ হচ্ছে; আমি অনেককে দেখেছি তারা মুসা আলাইহিস সালামের উক্ত কথাটিকে "হে আমার রব আমি আপনার প্রতি দ্রুতপদে এসেছি যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন"- কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে ব্যবহার করেন। যেমন আত্মোৎসর্গমূলক (আত্মঘাতী) অপারেশনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে। যদিও আমি নিজেও তা কিছু ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে জায়েয মনে করি, কিন্তু আমার আপত্তি হলো; এ বাক্য সেক্ষেত্রে কিছুতেই দলীল হিসেবে উপযুক্ত নয়। কেননা এটা ভুলের পর আত্মপক্ষ সমর্থন করা বৈ কি। তাহলে কীভাবে এ আয়াতকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে? আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

এমনকি আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে বলেছেন;

قالَ اللّٰهُ تَعالى: بادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عليه الجَنَّةَ

অর্থঃ "আমার বান্দা নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার থেকে অগ্রগামী হলো, কাজেই আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।"– [বুখারী, হাদীস নং ৩৪৬৩]

এই বক্তব্য দ্বারা নিশ্চিতভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর ফয়সালার পূর্বে এমন তাড়াহুড়া করা নিন্দনীয় তাড়াহুড়ারই অংশ। সেটা আমাদের পূর্বে বর্ণনাকৃত তাড়াহুড়োর অর্থে। এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। উক্ত হাদীসটি

আত্মহত্যা যে ভয়াবহ গুনাহের কাজ তারও একটি দলীল। আত্মহত্যা এবং আত্মোৎসর্গের মাঝে অবশ্যই ব্যবধান রয়েছে। আমরা আত্মোৎসর্গ হামলাকে বৈধতা মনে করার কারণ হচ্ছে; তা কেবল জরুরি প্রয়োজনে দীনের সাহায্য এবং দীনকে বিজয়ী করার জন্যই হয়ে থাকে। এ বিষয়ের প্রমাণাদি যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে; মানুষ কি কখনো বলবে যে, এ হাদীসে কুদসীটি আত্মোৎসর্গমূলক অপারেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে? উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি আত্মোৎসর্গমূলক হামলার ক্ষেত্রে এ বাক্য ব্যবহার করি; "হে আমার রব আমি আমার প্রাণের বিষয়ে তোমার হতে আগে বেড়ে গেলাম।" তাহলে এটা স্পষ্টই বালাগাত শাস্ত্র এমনকি রুচিবোধ এবং ভাষা সাহিত্যের বহির্ভূত ব্যবহার হবে।

আমি প্রসিদ্ধ অনেক উলামায়ে কেরামের গ্রহণযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ ঘেঁটে দেখেছি; শুধু এতটুকু জানার জন্য যে, নিম্নোক্ত আয়াতে ف কিসের অর্থে এসেছে।

فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

অর্থঃ "আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর।" [সুরা ত্বা-হা - ২০:৮৫]

কিন্তু তাদের অধিকাংশকেই দেখলাম এ বিষয়ে তারা তেমন কোনো আলোচনা করেননি। তবে সর্বশেষ এ বিষয়ে জানতে পেরেছি, তাহের ইবনে আশুর রহিমাহুল্লাহ এর মূল্যবান কিতাব 'আত তানভীর ওয়াত তাহরীর' থেকে। তিনি বলেন الإعجال। শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু তড়িৎ গতিতে করা। আর এ ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয় নিন্দা অর্থে। মুফাসসিরীনে কেরামের ব্যাখ্যা এবং উক্ত আয়াতের ইশারা থেকে যেটা বুঝে আসছে সেটা হচ্ছে, মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে তাড়াতাড়ি এসেছেন, যাতে তিনি আল্লাহর সাথে নির্ধারিত সময়ের আগে, বনি ইসরাঈল তুর পাহাড়ের জড়ো হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর সাথে একান্তে মিলিত হতে পারেন। তবে এটা ছিল কেবল তাঁর পক্ষ থেকে ইজতিহাদ, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী শরীয়ত গ্রহণের ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহ। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে তিনি কেবল নিজের এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কল্যাণের কথাই ভেবেছেন। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে তিরস্কার করেছেন। কারণ

তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর সাথে 'অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে' অসিয়ত করা এবং তাদেরকে কূটচক্রান্তকারীদের চক্রান্তের বিষয়ে সতর্ক করার পূর্বেই চলে এসেছেন। তিনি তাদের থেকে নিজের দূরত্বের পরিণতির ব্যাপারেও বেখবর ছিলেন। এ বিষয়টি অনেকটা আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনার সাথে মিলে যায়। একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে চলে গেছেন, তাই তিনি দৌড়ে কাতারে গেলেন এবং রুকুতে শরীক হলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, “আল্লাহ তাআলা তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিক, তবে এই কাজ তুমি আর কখনো করবে না।”

মুসা আলাইহিস সালামের উক্ত ঘটনার আরেকটা শিক্ষা আমরা উল্লেখ করব। সেটা হচ্ছে, মুজতাহিদ তার ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিপরীত দলীলের ব্যাপারে না জেনেই তা গ্রহণ করা। উক্ত বিষয়টিই তাঁর সম্প্রদায়ের মূর্তি তৈরি করা এবং পূজায় লিপ্ত হওয়ার কারণ ছিল। মুসা আলাইহিস সালামের এই কথাটি বোঝাচ্ছে যে, (এইতো তারা আমার পিছনেই রয়েছে) বনি ইসরাঈল তার পিছনেই চলছিল এবং তিনি তাদের থেকে একটু অগ্রে ছিলেন, আল্লাহর সাথে একান্তে মিলিত হওয়ার জন্য। তবে তিনি আগে বেড়ে যাওয়ার ওজরও পেশ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর আদেশের প্রতি দ্রুত বেগে ছুটে চলার কারণ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা বৈ কিছু নয়।

নিম্নোক্ত আয়াতেও তাড়াহুড়ার ব্যাপারে এক ধরনের তিরস্কার রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন;

فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

অর্থঃ “অবশ্যই আমি পরীক্ষা করেছি তোমার সম্প্রদায়কে তোমার পর।” [সুরা ত্বা-হা - ২০:৮৫]

কেননা এর ফলেই তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে ফিতনার আবির্ভাব হয়েছিল। তবে এখানে আল্লাহ তাআলার এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁকে এই বিষয়ে শিক্ষা

দেয়া, যাতে তিনি নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আগে বেড়ে না যান। যদিও সেটা কল্যাণকর কোনো বিষয়ের প্রতি অতি আগ্রহের কারণে হয়ে থাকুক না কেন।

উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, তাড়াহুড়ার কারণে বিপদ এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। যদিও সেটা ইজতেহাদ প্রসূত হয়। আরো বুঝে আসে যে, আল্লাহ তাআলা যে সকল বিষয়ের ফয়সালা পূর্বেই করে রেখেছেন, তার কারণে বান্দাকে পাকড়াও করবেন না। সবকিছুর সারকথা হচ্ছে, যে বিষয়ে রাসূলকে তিরস্কার করা হয়েছে তা থেকে পরিপূর্ণরূপে সতর্ক থাকা। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে সম্মানিত এবং সবচেয়ে প্রজ্ঞাময়। সকল গুনাহ থেকে তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যথাসম্ভব ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি রহিমাহুল্লাহ উপর্যুক্ত বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, মুসা আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে ছেড়ে আসার পরে তাদের মাঝে ফিতনার আবির্ভাব হয়েছে, অথচ তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে এমন দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল না। উক্ত মাযমুনকে বোঝানোর জন্যই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন;

আল্লাহ তাআলা বলেন;

فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

অর্থঃ "অবশ্যই আমি তোমার সম্প্রদায়কে তোমার পরে পরীক্ষা করেছি।" [সুরা ত্বা-হা - ২০:৮৫]

ইমাম আলুসি রহিমাহুল্লাহ 'তাফসীরে রুহুল মাআনিতে' ف হরফটির আরেকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এখানে উক্ত আয়াতে 'ف' হরফটি পূর্ববর্তী কথার কারণ হিসেবে এসেছে। যেন বলা হচ্ছে, আপনি আপনার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে আগে চলে আসা যে কারণেই হোক, তাদের বিষয়ে অবহেলা করা উচিত হয়নি। কারণ, তারা আপনাকে নতুন নতুন অনুসরণ করছে, তাদের মাঝে নির্বুদ্ধিতা এবং বোকামির পরিমাণও অনেক বেশি, যার ফলে শয়তান তাদেরকে হয়তো কোনোভাবে তার চক্রান্তে ফেলে দিবে এবং তাদেরকে গোমরাহ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর আপনি যাদেরকে আপনার ভাইয়ের সাথে রেখে

এসেছেন, তারা আপনার আসার পরেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। সামেরি তাদেরকে গোমরাহ করেছে। এই হালতে যাদেরকে পিছনে ফেলে চলে এসেছেন তাদের ব্যাপারে কীভাবে আপনি আশ্বস্ত হবেন? এই বিষয়টিকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখবেন?

আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

ফায়দা: উক্ত আয়াতে **عجلة** শব্দটি নিন্দনীয় এবং প্রশংসনীয় উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিন্দনীয় বিষয়টি তো নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وما أعجلك عن قومك يا موسى

অর্থঃ "হে মুসা! আপনি তাড়াহুড়া করে আপনার সম্প্রদায়ের আগে আগে কেন আসলেন?" **[-সূরা তহা ২০:৮৩]**

অপরদিকে এ শব্দটির প্রশংসনীয় দিক হচ্ছে; কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি দ্রুত বেগে ধাবিত হওয়া। যেটা মুসা আলাইহিস সালামের উক্ত কথার মাঝেই ফুটে ওঠে, তিনি বলেন; "হে আমার প্রতিপালক আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম.." যদিও এ বিষয়টি তিনি তার ধারণা এবং ইজতেহাদ অনুযায়ীই বলেছেন। আমরা এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

প্রতিটি কাজ নির্ধারিত সময়ে করা চাই

আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কাজের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করেছেন। দূরদর্শী ও জ্ঞানীরা বলে থাকেন, যেকোনো কাজে চূড়ান্ত সফলতা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত সময় ও সঠিক স্থান নির্বাচন করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ব্যতীত, নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই যদি কেউ কোনো কাজ করে তাহলে হতাশা, ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনাই তার শেষ প্রাপ্তি। হতে পারে তা দুনিয়াতে কিংবা আখিরাতে কিংবা উভয় জগতে। ইসলামী শরীয়তেও এ ক্ষেত্রে এমনই নির্দেশ দেয়। কেননা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটিই আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ ও মূলনীতি। তাই সকল মুসলিম যুবকের কর্তব্য হলো, বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করা এবং এই মূলনীতির ওপর সব-সময় গুরুত্ব প্রদান করা। আর রাজনৈতিক বিপ্লব ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব

আরো অপরিসীম। এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ভুলই সফলতাকে ব্যর্থতার অতল গহ্বরে ঠেলে দেবে। চাই তা উপযুক্ত সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে হোক বা পর্যাপ্ত প্রস্তুতির কমতির কারণে হোক। কেননা এটিই আল্লাহর সুন্নাহ। সুতরাং প্রত্যেক কাজের জন্য সঠিক ও উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে হবে।

উল্লেখ্য: আমরা এখানে স্বাভাবিক পরিস্থিতির ব্যাপারে বলছি, জরুরি মুহূর্তের নয়।

অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের জন্য শরীয়তের শর্তাবলী বিদ্যমান থাকাবস্থায় যদি বিদ্রোহ বিলম্বেরও পর্যাপ্ত কারণ পাওয়া যায় তাহলে বিদ্রোহকারীদের জন্য উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক। যেন তারা সে সময়ের মধ্যে বিজয়ের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয়। কেননা, শরীয়ত জিহাদের সামর্থ্য না থাকা অবস্থায় ইদাদ গ্রহণকে ফরয করেছে।

তবে শত্রুর আক্রমণের ফলে যদি পরিস্থিতির নাজুকতা এত বেশি হয় যে, পাল্টা আক্রমণ না করলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনেক হবে; এর তুলনায় বিদ্রোহে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম, তাহলে অবশ্যই বিদ্রোহ করতে হবে, তখন বসে থাকার কোনো সুযোগ থাকবে না। যেহেতু শরঈ অনুমতি ও বৈধতা বিদ্যমান, তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়তে হবে এবং যতটুকু সফলতা অর্জিত হয় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আর আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখতে হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব ও উপযুক্ত সময়ের অনুপস্থিতির দরুন চূড়ান্ত সফলতা ও লক্ষ্যে না পৌঁছার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এখানে মন্দের ভালো তথা দুই ক্ষতির মাঝে হালকাটা গ্রহণের নীতি অনুসরণ করা হবে।

মোটকথা, যখন শরীয়ত কর্তৃক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বৈধতা পাওয়া যাবে (যেমন, শরীয়তের আলোকে সুস্পষ্ট কোনো কুফর পাওয়া যাওয়া) তখন যদি কোনো ব্যক্তি একাই যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ে এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যায়, তারপরও তাকে জিহাদ থেকে বারণ করার কোনো বৈধতা নেই। এমনকি যদি তার এই জিহাদের কারণে কুফফারদের পক্ষ থেকে আক্রমণের মাত্রা বেড়ে যায়, রক্তপাত হানাহানি বেড়ে যায়, পূর্ব থেকে চলে আসা কোনো জিহাদি বা দাওয়াতি কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়, অন্য কোনো দীনি কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবুও। এসব কিছু কখনোই চলমান কুফরের কারণে সৃষ্ট ফিতনা-ফাসাদ থেকে বড়

কোনো অপরাধ নয়। তবে যখন এটা সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে যে, তার এই জিহাদের কারণে চলমান কুফরের শক্তি, ক্ষমতা ও আধিপত্য আরো পাকাপোক্ত হয়ে যাবে, তাহলে তাকে বাঁধা দিতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এটিই হলো শরীয়তের সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মাপকাঠি। তবে এখানে অনেকে মতানৈক্য করেছেন।

যেমন কেউ বলেছেন,

তার একাকী জিহাদের কারণে যদি উপরে উল্লেখিত ক্ষতিগুলোসহ কুফফারদের শক্তি, ক্ষমতা ও আধিপত্য আরো পাকাপোক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত মনে হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে জিহাদ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সুনিশ্চিত বিজয়ের পরিবেশ হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর এ অবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে তাকে সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

আবার কেউ কেউ বলেন,

যেহেতু এগুলো হলো ধারণা প্রসূত কিছু ক্ষতি এবং উপরে উল্লেখিত ক্ষতির সম্ভাবনা নিতান্তই কম, তাই তার জিহাদ বৈধ হবে। তিনি আরো বলেন, কুফফারদের শক্তি ও আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়া নিছক ধারণা মাত্র, যার কোনো বাস্তবতা নেই। কেননা এমনও হতে পারে, দীর্ঘ যুদ্ধের পর তাদের পতন ঘটবে কিংবা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অনিষ্ট কমে যাবে। সুতরাং যদি তারা পরাজিত হয় এবং তাদের পতন ঘটে তাহলে তো আমরা সেখানে আল্লাহর হুকুমই বাস্তবায়ন করবো। আর সেটাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই।

এখন কথা হলো, যদি তারা পরাজিত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের ক্ষমতা দুর্বল হবে ও সমাজেও তাদের অনিষ্ট কমে যাবে। বলা বাহুল্য এর দ্বারা ব্যাপক কিছু দীনি ফায়দাও হবে। যেমন, মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি পাবে, কাফেরদের উৎখাত ও তাদের থেকে স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রতি উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, তাদের মাঝে দৃঢ় মনোবল তৈরি হবে, ঐক্য ফিরে আসবে, লাঞ্ছনার চাদর সরে যাবে এবং নতুন উদ্যমে পরবর্তী ধাপের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ। এমনকি

তাদের মাঝে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত কর্মঠ এক নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে, যারা ইসলামের বীর সেনানীদের প্রকৃত উত্তরসূরি হবে। কবি বলেন,

وفي القتلى لأقوام حياة

وفي الأسرى فدى لهم وعتق

লড়াইয়ের মধ্যেই জাতির জীবন নিহিত –

আর বন্দীত্বের মাঝেই আছে জাতির মুক্তি

সুতরাং কোনো উম্মতের মাঝে যদি এই চেতনা না থাকে তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

সারকথা হলো, আমাদের এই সংগ্রাম যদিও তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে না পৌঁছে, তবুও তা হকের পথে আমাদের এক ধাপ এগিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ। কেননা এর দ্বারা আমরা অন্তত নিজেদেরকে কুফর ও এই কুফরী ব্যবস্থার খারাবি থেকে বাঁচাতে পারব ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া আরো কিছু লক্ষ্য অর্জিত হবে। যেমন, আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা, জান-মাল দিয়ে আল্লাহর দীনের সাহায্য করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাতে উঁচু মাকাম লাভ করা।

আমার কাছে এই দ্বিতীয় মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। আর আমি মনে করি, এই বিষয়ে আহলে ইলমদের অনেক লেখা প্রয়োজন।

আল্লাহই ভালো জানেন। তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। তাঁর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ থেকে বাঁচার ও সৎকাজ করার কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহর কাছে সমস্ত পদস্খলন থেকে ক্ষমা চাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আমাদের প্রিয়জনদের সঠিক পথ দেখান। আমীন।

চতুর্থ মজলিস

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা

"ولكنكم تستعجلون" (কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো)

খাব্বাব ইবনে আরাত্তি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

-شَكَوْنا إلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً له في ظِلِّ الكَعْبَةِ فَقُلْنا: ألا تَسْتَنْصِرُ لنا ألا تَدْعُو لَنا؟ فقالَ: قدْ كانَ مَن قَبْلَكُمْ، يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فيُحْفَرُ له في الأرْضِ، فيُجْعَلُ فيها، فيُجاءُ بالمِنْشارِ فيُوضَعُ على رَأْسِهِ فيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، ويُمْشَطُ بأَمْشاطِ الحَدِيدِ، ما دُونَ لَحْمِهِ وعَظْمِهِ، فَما يَصُدُّهُ ذلكَ عن دِينِهِ، واللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هذا الأمْرُ، حتّى يَسِيرَ الرّاكِبُ مِن صَنْعاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ، لا يَخافُ إلّا اللَّهَ، والذِّئْبَ على غَنَمِهِ، ولَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার প্রাঙ্গণে নিজের চাদর মোবারককে বালিশ বানিয়ে শুয়ে আছেন। তখন আমরা তাঁর কাছে অভিযোগের সুরে বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না?" তখন রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের পূর্বের যামানায় তো লোকদেরকে পাকড়াও করে মাটির গর্তে রাখা হতো, এরপর মাথায় করাত রেখে তাদেরকে দ্বি-খণ্ডিত করা হতো। লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের গোস্ত ও হাড্ডি আঁচড়ানো হতো। কিন্তু তারপরও তারা দীনের উপর অবিচল ছিলেন। আল্লাহর কসম! অবশ্যই এই দীন একদিন পূর্ণতা লাভ করবে। একপর্যায় এমন হবে যে, আরোহীরা কোনো প্রকার ভয়-ভীতি এবং রাখাল বকরীর পালের উপর নেকড়ের আশঙ্কা ছাড়া 'সানআ' থেকে 'হাজরামাউত' পর্যন্ত সফর করবে। তখন তারা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবে। কিন্তু তোমরা তো দেখি তাড়াহুড়া করছো।" (সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৯৪৩)

এই হাদীস দিয়ে বিভিন্ন দাঈ এবং সংগঠন ইসলামী জাগরণের ক্ষেত্রে দলীল দিয়ে থাকেন। এটির মাধ্যমে সমাজ সংশোধন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে নিজেদের ভাবনা ও

দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতার প্রমাণ পেশ করেন। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাড়াহুড়াকে নিন্দনীয় মনে করেন এবং তাড়াহুড়া করতেও নিষেধ করেন। এমনকি অনেকে প্রতিপক্ষকে এ বলে নিন্দা করেন যে, এরা তাড়াহুড়া করছে।

সারকথা হলো, প্রত্যেকের কাছেই 'তাড়াহুড়া' একটি অপছন্দনীয় কাজ। তবে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাড়াহুড়া কোনটি তা মতানৈক্যের বিষয়।

তাই আমরা হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ আপনি আমাদের তাওফীক দান করুন।

আমাদের প্রিয় দীনি ভাইয়েরা!

আমরা সর্বদা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন তিনি আমাদের এবং আপনাদের সবাইকে নেককাজ করার তাওফীক দান করেন। সবাইকে হেদায়াতের উপর অবিচল রাখেন। আমীন।

নিঃসন্দেহে সকলের ঐকমত্যে তাড়াহুড়া একটি অপছন্দনীয় কাজ। আলহামদুলিল্লাহ আমরা পূর্বেও এবিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু জানার বিষয় হলো, কোন ধরনের তাড়াহুড়া নিন্দনীয়? কখন কোন কাজ তাড়াহুড়া বলে বিবেচিত হবে? সর্বোপরি, তাড়াহুড়ার সীমারেখা কী? যেকোনো তাড়াহুড়াই কী নিন্দিত? না, কিছু কিছু তাড়াহুড়া এমন আছে, যা নন্দিত? এটিই হলো আলোচনা পর্যালোচনার জায়গা। গবেষণা ও লেখালেখি এ পয়েন্টকে ঘিরেই হওয়া চাই। এ বিষয়টির তাতবীক-ই সকল বিতর্কের মূল। তাই বর্তমান বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে লিখতে হবে এবং বিশ্লেষণ করতে হবে। তাওফীক একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ-

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّه-

আমরা প্রথমে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে তারপর বিস্তারিত উত্তর দেবো। পরিশেষে হাদীস থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করবো। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর:-

নিন্দনীয় তাড়াহুড়া হচ্ছে, সময় আসার পূর্বে কোনো জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করা। অর্থাৎ সময় আসার আগেই তা পাওয়ার চেষ্টা করা। এই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। যেকোনো জিনিস লাভ করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কিছু উপায় উপকরণ রয়েছে। এখন কেউ যদি এসব উপায়-উপকরণ যথাযথভাবে গ্রহণ না করে বস্তুটি অর্জন করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি তাড়াহুড়া করেছো। প্রশ্ন হলো, আমরা কীভাবে বুঝতে পারবো যে, আমরা কোনো প্রকার তাড়াহুড়া ছাড়াই নির্ধারিত সময়ে কোনো কিছু লাভ করার চেষ্টা করছি? এর আলামত কী? আমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত বস্তুর উপযুক্ত সময় বোঝার মাধ্যম কী হবে? যাতে করে আমরা সময়ের আগে কাজ করার মতো একটা নিন্দনীয় কাজ থেকে বাঁচতে পারি..?

উত্তর: প্রত্যেক জিনিসের উপযুক্ত সময় রয়েছে। তবে তা জানার মাধ্যমগুলো হলো, কুরআন-হাদীস। কিংবা তার কাছাকাছি কোনো দলীল। অথবা কুরআন ও হাদীসের শাব্দিক অর্থ। আর যদি কুরআন-হাদীসের সরাসরি কোনো ইবারত না থাকে, তাহলে কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত অন্য কোনো দলীল।

মোটকথা:

কোনো জিনিসের উপযুক্ত সময় জানার মাধ্যম দুটি। এক. কুরআন-হাদীস। দুই. ইজতেহাদ। যদি সে বিষয়টি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায়, তাহলে কোনোপ্রকার ইজতেহাদ ছাড়াই আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে তৎক্ষণাৎ অনুরূপ আমল করতে হবে। যদি উজর ও দুর্বলতাবশত সে অনুযায়ী আমল করা অসম্ভব হয়, তখন কী করণীয়? তা নিয়ে আবার একটু নতুন করে শরীয়তের আলোকে ভাবতে হবে। আর যদি কুরআন-হাদীসে বিষয়টির সমাধান না পাওয়া যায় তখন ইজতেহাদ করতে হবে।

ইজতেহাদ করতে হলে আমাদেরকে ফিকহের মূলনীতিসহ উলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ মূলনীতির অনুসরণ করতে হবে। আলোচিত বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলার সাথে তুলনা করতে হবে। ইজতেহাদ করার সময় খোদাভীতি-ইখলাস ও লিল্লহিয়্যাত নিয়ে ক্রমাগত শরয়ী দলীলগুলোকে সাজাতে হবে। চিন্তা করতে হবে,

আল্লাহ তাআলা বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের থেকে কী চাচ্ছেন এবং কী করলে তিনি আমাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন। যাতে করে প্রথমে আমাদের আখিরাতের স্বার্থ ও পাশাপাশি যতটুকু সম্ভব দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিল হয়।

প্রথম দলীল: কুরআন-হাদীস। এক্ষেত্রে হকপন্থী উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো মতবিরোধ থাকতে পারবে না। যারা কুরআন-হাদীসকে মানবে না তারা অপরাধ অনুপাতে শরীয়ত কর্তৃক শর্তের আলোকে শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং ততটুকু তিরস্কার ও ঘৃণার পাত্র হবে।

দ্বিতীয় দলীল: ইজতেহাদ; তবে মেধা ও বোঝার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে ইজতেহাদের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা, মতবিরোধ এবং মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। কারণ, ইজতেহাদ হলো ইলমের ময়দানে শাহ-সাওয়ার উলামায়ে কেরাম ও সমকক্ষদের প্রতিযোগিতার মাঠ। এমন পরিস্থিতি দীন-দুনিয়ার মতবিরোধপূর্ণ সকল মাসআলার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ইজতেহাদের ক্ষেত্রে প্রথমত আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে এবং কাজের সকল উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে হবে। এরপর আল্লাহর তাওফীক নিয়ে ইজতেহাদ শুরু করতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন;

احرص على ما ينفعُك واستعن بالله ولا تعجز

অর্থ: "তোমার উপকারে আসবে এমন সব বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হও। সেক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। অক্ষম হয়ে পড়ো না।"

যখন কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিবে, তখন অবশ্যই ইখতেলাফের ক্ষেত্রে তার আদব ও মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে। ইখতেলাফের মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। ইখতেলাফের আদব নিয়ে উলামায়ে কেরাম অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, নিন্দনীয় তাড়াহুড়া হচ্ছে, সময় আসার পূর্বে কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। অর্থাৎ সময় আসার আগেই বস্তুটি পাওয়ার চেষ্টা করা। যেকোনো জিনিস লাভ করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কিছু উপায়-উপকরণ রয়েছে। এখন কেউ যদি এসব উপায়-উপকরণ যথাযথভাবে গ্রহণ

করার পূর্বে বস্তুটি অর্জন করার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি তাড়াহুড়া করেছো। নচেৎ তাকে তাড়াহুড়াকারী বলা হবে না।

এখন জানার বিষয় হলো, কোন কোন জিনিস আসলে উপায়-উপকরণ হতে পারবে আর কোন জিনিস হতে পারবে না?

সেটা জানা যাবে দুইভাবে।

এক. শরয়ী দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে– তথা শরীয়ত নির্ধারণ করবে যে উক্ত কাজের সফলতায় পৌঁছার মাধ্যম হবে এটি।

দুই. অনুভব অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে– তথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যাবে যে, উক্ত কাজের সফলতায় পৌঁছার মাধ্যম হবে এটি।

তবে দুটি পদ্ধতিতেই প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার এবং হোঁচট খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই খুব সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে। সফলতার সকল উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর দাসত্বের পরিচয় দিতে হবে। যাতে আল্লাহ তাআলা তাকে তাওফীক দান করেন। আল্লাহই তো প্রকৃত তাওফীকদাতা।

এই পর্যন্ত ছিল সংক্ষিপ্ত উত্তর। হক ও কল্যাণের পথে চলতে হলে মৃত্যু পর্যন্ত এ দুটিকে নিজের জীবনের জন্য মূলনীতি বানিয়ে নিতে হবে।

এক. প্রতিটি ক্ষেত্রে শরয়ী দলীলকে সামনে রাখতে হবে।

দুই. বাস্তব জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

বিস্তারিত উত্তর:-

এখন আমরা হাদীসে নববীর বাস্তবতা থেকে কিছু উদাহরণ পেশ করবো। আলোচনা হবে দুটি বিষয় নিয়ে, প্রথমত উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরবো নিন্দনীয় তাড়াহুড়া কী? দ্বিতীয়ত সেই উদাহরণ এবং তার মাঝে আলোচিত তাড়াহুড়ার দাবি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

আমরা হাদীসটির দিকে তাকাই। দেখি তাতে আমাদের জন্য কী কী শিক্ষা রয়েছে। হাদীসটির মধ্যে রয়েছে, মক্কী জীবনে সাহাবায়ে কেরাম কুরাইশ কাফেরদের জুলুম

নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করেছেন। নিজেদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে ও সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন।

প্রশ্ন হলো : হাদীস থেকে এটি কীভাবে বুঝে আসে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরামের উল্লেখিত আচরণটি নিন্দনীয় এবং অনুচিত ছিল?

উত্তর:- (এই উত্তর কিছুটা বিস্তারিত দিতে হবে। আল্লাহ সঠিক পথ দেখান)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য

ولكنكم تستعجلون

অর্থঃ ‘কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো’

এই অংশ থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামের এমন আচরণকে তাড়াহুড়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে প্রশ্ন হলো, সাহাবায়ে কেরাম কী এমন আচরণ করেছেন? তারা কী শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দোয়ার আবদার করেছেন? না এর চেয়ে বেশি কিছু করেছেন? যার দরুন তিনি তাদেরকে বলেছেন, “কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো”

প্রথম ব্যাখ্যা:-

হাদীসের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, শুধু দোয়া চাওয়ার কারণে তিনি তাদেরকে বলেননি যে, “কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।” বরং হয়তো তাঁরা তাঁদের উপর কাফেরদের আযাবের এই কঠিন পরিস্থিতির কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি তাঁদেরকে তাড়াহুড়া না করতে ধমক দিয়েছেন। তবে কাফেরদের উপর মুমিনদের বিজয় অর্জনের তাড়াহুড়া করাটা যেহেতু স্বভাবজাত বিষয়, তাই শুধু এটির উপর ভিত্তি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ধমক দেননি। আল্লাহই ভালো জানেন।

তাছাড়া শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দ্রুত সাহায্য প্রার্থনা অর্থাৎ সাহায্যপ্রাপ্তির প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা নিঃসন্দেহে একটি স্বভাবজাত এবং প্রশংসিত বিষয়। তাই এটি তিরস্কারের মূল পয়েন্ট নয়।

সারকথা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য- "কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো" এর অর্থ হলো, তিনি তাঁদের বাস্তবিক ও বাহ্যিক অবস্থা তুলে ধরে বলেছেন, "কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।"

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা:-

হয়তো কখনো সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)- এর মধ্যে কেউ কেউ এই কঠিন পরিস্থিতিতে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আর যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, তাই তিনি তাঁদেরকে এমন কাজ থেকে বারণ করেছেন এবং সংশোধন করেছেন (যদিও তা অন্যদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক কাজ)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তাঁদেরকে এবং পরবর্তী উম্মাহকে একটি উপকারী ইলম ও হিকমাহ শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকে তাঁর কাওমের পক্ষ হতে যেমন প্রতিদান করেছেন, আমাদের পক্ষ হতে এবং সকল উম্মতের পক্ষ হতে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করুন । আমার বাবা-মা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক। এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, উম্মাহকে দীন ও ইলম শিক্ষা দেয়া।

স্বয়ং হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কেননা হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত "ألا" শব্দটি "تحضيض" (উদ্বুদ্ধ করা) এর জন্য এসেছে। অর্থাৎ বিরক্তি প্রকাশের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করার জন্য "ألا" শব্দটি এসেছে। শব্দটি প্রায় সকল রেওয়ায়েতের মধ্যে এসেছে, তাই আশা করি শব্দটি হাদীসের অংশ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এই কথার প্রমাণ হিসাবে অন্য রেওয়ায়েতে আসা "شكونا" (অভিযোগ করেছি) এ শব্দটিকেও যুক্ত করা যেতে পারে।

অন্য রেওয়ায়েতের মধ্যে আছে;

أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فجلس مغضبا محمرا وجهه، فقال إن من كان قبلكم ليسأل الكلمة فما يعطيها، فيوضع عليه المنشار فيشق باثنين، ما يصرفه عن دينه، وإن كان أحدهم ليمشط ما دون عظامه من لحم أو عصب بأمشاط الحديد وما يصرفه ذاك عن دينه .

অর্থ: "আমরা রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করলাম। তখন আমরা দেখতে পেলাম যে, একটি চাদরকে বালিশ বানিয়ে তিনি কাবা চত্বরে শুয়ে আছেন। সেই সময়ে আমরা মুশরিকদের পক্ষ হতে থেকে জুলুম নির্যাতনের শিকার হই। তখন আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না?" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত ও রক্তিম চেহারা নিয়ে উঠে বসলেন। তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বসূরিদেরকে একটি কুফরী শব্দ বলার জন্য বাধ্য করা হতো। কিন্তু তারা সেই কুফরী বাক্য বলতেন না, ফলে করাত দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। কিন্তু তারপরও সে ধর্ম ত্যাগ করে করতো না। তাদের কাউকে লোহার চিরুনি দিয়ে হাড্ডি এবং গোস্ত কিংবা শিরায় আঁচড়ানো হতো। কিন্তু তারপরও সে ধর্মকে ত্যাগ করতো না।" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)। হাদীসের শব্দগুলো সহীহ ইবনে হিব্বানের।

এ হাদীসের আলোচনা থেকে বোঝা যায়; শুধু সাহায্যের দোয়া করতে বলায় রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর রাগান্বিত হননি এবং তাঁর চেহারা মোবারকও লাল হয়নি। বরং নিশ্চয় এরচেয়ে বেশি কিছু হওয়ায় তিনি রাগান্বিত হয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরামের উক্তি

"ألا تستنصر لنا"

(অর্থাৎ আপনি কি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করবেন না?)

হাদীসের এই অংশের মধ্যে "النصر" (সাহায্য) শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। সাহায্য বলতে কোন ধরনের সাহায্য উদ্দেশ্য? তার মধ্যে অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে। সম্ভবত তাঁরা এই ধারণা করেছেন, পূর্বের নবীগণকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেছেন তাদের শত্রুদেরকে সমূলে ধ্বংস করার মাধ্যমে। তাই নিজেদের জন্যও তাঁরা রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই ধরনের সাহায্য কামনা করেছেন। এটিও রাগের একটি কারণ হতে পারে।

সাহায্য ও দোয়া প্রার্থনা করার পর তিনি তাদেরকে বললেন;

قد كان الرجل فيمن قبلكم

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা এমন হতো যে, ...।

হাদীসের এই অংশের মাধ্যমে তাদের সামনে তিনি পূর্বসূরিদের মধ্য হতে নবীর অনুসারী এবং নেককারদের দৃষ্টান্ত পেশ করেন। যাতে তারা জানতে পারে যে, এই ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের আদর্শ কী ছিল? তারা তো তোমাদের চেয়েও বেশি জুলুম-নির্যাতনের শিকার করেছেন, তোমাদের চেয়েও বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন। তারপরও কিন্তু তারা দীনকে আঁকড়ে ধরেছেন, দীনের উপর অবিচল থেকেছেন, দীন ও আখিরাতকে নিজের জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুতরাং হে সাহাবীরা! তোমরাও তাদের মতো ধৈর্যধারণ করো এবং তাদেরকে তোমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করো।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধৈর্য, ক্ষমা ও মাফ করতে বলার বাহ্যিক হিকমাহ নিয়ে উলামায়ে কেরাম বলেন, তখন ইসলাম চেয়েছে সাহাবায়ে কেরাম থেকে বেশি বেশি কুরবানী, আত্মত্যাগ ও ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে। তাই তিনি তাদেরকে বলেছেন, "কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।"

এই ব্যাখ্যানুসারে "তাড়াহুড়া" হলো, জুলুম-নির্যাতনের উপর বিরক্তি প্রকাশ করা এবং এই কথা বলা যে, এখনো দেখি আল্লাহর সাহায্য আসছে না। সাহাবায়ে কেরাম উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার প্রথম সারির লোক। তাঁদের উপর টিকে আছে পুরো

দীন, ইসলাম। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সুউচ্চ মহান মর্যাদার জন্য প্রস্তুত করেছেন। তাই তাঁদেরকে বিপদে-আপদে অন্যদের তুলনায় বেশি ধৈর্যধারণ, কুরবানী ও কষ্ট করতে হবে। কেননা এতে আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট এবং মহান হিকমাহ ও প্রজ্ঞা নিহিত আছে।

আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি নেই, সহায় নেই।

মোটকথা হচ্ছে, শত্রুর জন্য বদদোয়া করা এবং সে জন্য নেককারদের কাছে দোয়া চাওয়া নিন্দনীয় কিংবা নিষিদ্ধ কোনো বিষয় নয়। হাদীসের মধ্যে এর কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। “তোমরা তাড়াহুড়া করছো” হাদীসের এই বাক্য থেকেও সেদিকে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আর তা ছাড়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পরিস্থিতিতে এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতেও কাফেরদের জন্য বদদোয়া করেছেন। আচ্ছা এই বিষয়ে আমরা পরে কোথাও জানতে পারবো। জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা। তেমনি শত্রুর বিপক্ষে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা নিন্দনীয় কোনো বিষয় নয়, বরং এটি সর্বদা প্রশংসনীয়। “النصر” এর অর্থ হলো, শত্রু ও জালিমের বিরুদ্ধে সাহায্য করা।

প্রশ্ন: তখন কি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের জন্য দোয়া করেছেন? নাকি করেন নাই? আর যদি দোয়া না করে থাকেন তাহলে এর কারণ কী?

উত্তর: ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “তোমরা আমার কাছে দোয়া করো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।”

অন্য আয়াতে আছে;

فلولا إِذۡ جَاءَهُمۡ بَأۡسُنَا تَضَرَّعُوا

অর্থ: "অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার (পক্ষ হতে) সংকট আসল, তখন তারা কেন অনুনয়-বিনয় করল না?" -[সূরা আনআম ০৬:৪৩]

যখন খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথিরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কাফেরদের জন্য বদদোয়া করার আবদার করেছেন তখন তিনি তাদের এই আবদার রক্ষা করেননি, অথচ আল্লাহ তাআলা বিপদের সময় তাঁর কাছে দোয়া করতে বলেছেন। কেননা রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, আগে থেকেই তাঁদের তাকদীর লেখা হয়ে গেছে যে, এবার তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হবে। এতে তাঁরা সাওয়াবের অধিকারী হবে। আর নবীদের অনুসারীদের ব্যাপারে এটাই আল্লাহর রীতি। আল্লাহর পথে চললে বিপদ আসবে। তাই নবীদের অনুসারীদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাতে তাঁরাই বিজয়ী ও অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবে। ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, তবে নবী ছাড়া অন্যদের কর্তব্য হচ্ছ, যেকোনো বিপদাপদ আসলেই আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। কেননা তারা কেউ জানে না যে, তাদের জন্য কেমন তাকদীর অপেক্ষা করছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তিনি ওহীর মাধ্যমে তাঁদের তাকদীর সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীর মধ্যে হাদীসটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাহাবায়ে কেরামদের জন্য দোয়া করেননি, তা হাদীসের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। বরং হয়তো এমন হতে পারে যে, তিনি দোয়া করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলেছেন, তোমাদের পূর্বসূরিদেরকে এমন এমন কঠিন শাস্তি দেয়া হতো ...। নির্ধারিত মেয়াদ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা ধৈর্যধারণ করো। সেই বিষয়ে হাদীসটিতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের শেষে বলেছেন, কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।

ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, নবী কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্যদের কর্তব্য হলো, যেকোনো বিপদে-আপদে আল্লাহর কাছে দোয়া করা, কেননা তিনি ওহীর মাধ্যমে তাদের তাকদীর সম্পর্কে জেনে গেছেন, কিন্তু অন্যরা তো জানতে পারবে না।

ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, উল্লেখিত ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের জন্য দোয়া করেননি। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁদের তাকদীর সম্পর্কে জানা ছিল। কিন্তু অন্যদের তাকদীর সম্পর্কে জানা নেই।

ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ এর এই বক্তব্যটি সঠিক। তবে এর অর্থ হলো ওহী নির্ভর কোনো বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব না। কিন্তু ইজতেহাদপূর্ণ দলীল নির্ভর মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও উম্মাহর নেতৃস্থানীয় জ্ঞানী ও উলামাগণের পক্ষে জানা সম্ভব। তখন উলামায়ে কেরামের কথা অনুযায়ী আমল করা জায়েয হবে। যদিও সেটি 'ইলমে ইয়াকীন' হোক কিংবা 'যন্নে গালেব' হোক। বলপ্রয়োগ কিংবা যুদ্ধের মাধ্যমে কখন শত্রুকে প্রতিহত করা যাবে আর কখন যাবে না? শত্রুর উপর কখন বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা যাবে আর কখন যাবে না? অনুনয়-বিনয়ের দাবিতে কখন আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে আরো অনেক বেশি কুরবানী ও আত্মত্যাগ করতে হবে আর কখন করতে হবে না? তা আলেমগণ বুঝতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ।

পঞ্চম মজলিস

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

অনেকে মুজাহিদদেরকে ও ইসলামী আন্দোলনের জগতে যারা ‘জিহাদী দল, জিহাদী আন্দোলন’ এধরনের নামে পরিচিতি লাভ করেছে, তাদেরকে এই বলে তিরস্কার করে যে, এই জিহাদীরা মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, শাসকদেরকে অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিহত করতে চায়। শক্তি, বলপ্রয়োগ, যুদ্ধ ও সামরিক শক্তির মাধ্যমে বর্তমান শাসকদেরকে সরাতে চায়। মূলত এরা যুদ্ধের মাধ্যমে শাসকদেরকে হটানোর প্রচেষ্টাকে হাদীসে নিষিদ্ধ তাড়াহুড়ার সাথে তুলনা করে। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে পূর্বোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করে থাকে এবং হাদীসের শেষের বাণী “কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো” কে প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করে।

চিন্তা করলে ন্যায়পরায়ণ গবেষকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, একমাত্র মুজাহিদগণই হচ্ছে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ। যেমনটি এই হাদীস থেকেও বুঝে আসে। আলহামদুলিল্লাহ এটি আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহ। যদিও কখনো কখনো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাড়াহুড়া করার কারণে মুজাহিদদের কেউ কেউ তিরস্কারের অধিকারী হন, এটি কোনো একক সমস্যা নয়; তাড়াহুড়ার মতো এমন ভুল মুজাহিদ অ-মুজাহিদ সকলেই করে। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, মুজাহিদগণ সবচেয়ে বেশি তাওফীকের অধিকারী এবং অন্যদের তুলনায় বেশি সঠিক কাজ করেন। আমাদের আলোচিত এই হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসের আলোকে বোঝা যাচ্ছে যে, তারাই সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান ।

মুজাহিদগণ এই সকল মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তাদেরকে অপসারণ করে তাদের কুফরী এবং জাহেলী সংবিধানের স্থানে আল্লাহর সংবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টার মতো এ মহান কাজ সম্পাদন করেছেন তারা। এককথায় মুজাহিদগণ আল্লাহর দেয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠার ফরয দায়িত্ব পালন

করছেন। আলহামদুলিল্লাহ এই ক্ষেত্রে তাদের সাথে এতো এতো কুরআন সুন্নাহর দলীল প্রমাণ আছে, যা নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

কারো কারো ধারণা, মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা 'হাদীসে নিষিদ্ধ তাড়াহুড়ার' অন্তর্ভুক্ত, এধরনের আন্দোলনকারীরা ভুলের উপর আছেন। এক্ষেত্রে তাদের দলীল হচ্ছে, ولكنكم تستعجلون "কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো" হাদীসের এই অংশ বিশেষ। যারা মনে করে এই সকল মুজাহিদ ভুলের উপর আছেন, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই ভুলের উপর আছে।

তাদের এই যুক্তি কয়েকটি কারণে সঠিক নয়।

এক. আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলো ওহী এবং সত্য। এগুলোর মাঝে পারস্পরিক কোনো বিরোধ নেই। তাই আমরা কুরআন সুন্নাহর একটিকে আরেকটির বিরুদ্ধে দাঁড় করাবো না। বরং দলীলগুলোর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য পূর্ণতা সৃষ্টি করে সব হাদীসের উপর আমল করবো। আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে আমরা মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট দলীল) এর সমাধানের জন্য মুহকাম (স্পষ্ট দলীল)-এর উপর নির্ভর করবো। কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা এই তিন দলীলের আলোকেই এই সকল মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। তাই কোনো মুমিনের জন্য দৃঢ়-মজবুত ও সুস্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত মাসআলাগুলোর বিপরীতে অস্পষ্ট দলীল দাঁড় করানো উচিত হবে না। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীল দেয়া যাবে না, কারণ প্রথমত হাদীসটির অর্থ যদিও স্পষ্ট তবে হাদীসের উদ্দেশ্যটি অস্পষ্ট। দ্বিতীয়ত হাদীসটি আলোচিত প্রেক্ষাপটেও বর্ণিত হয়নি।

আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, হাদীস তাড়াহুড়া করতে বারণ করেছে এবং নিন্দা করেছে। তাড়াহুড়া করা নিন্দিত বিষয়। এটি ঠিক। তবে প্রকৃতপক্ষে তাড়াহুড়া কাকে বলে? এই নিয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে। এর পাশাপাশি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আমরা যদি কোনো হুকুম মজবুত দলীলের মাধ্যমে জানতে

পারি, তাহলে ঐ বিধানের উপর আমল করতে গিয়ে এই কথা বলার সুযোগ নাই যে, এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা হয়েছে।

দুই. এই হাদীসের অর্থ হচ্ছে, তোমরা এতটাই তাড়াহুড়া করছো যে, তোমরা শরীয়তে নির্ধারিত স্বাভাবিক পদ্ধতির বিপরীতে সাহায্য কামনা করতে চাচ্ছো; তোমরা কামনা করছো সময়ের আগেই ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণতা চলে আসবে আর তোমরা সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে হতে হকপন্থীদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, জুলুম-নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং আল্লাহর অনুমতি, আদেশ-নির্দেশ আসা পর্যন্ত দীনের উপর অবিচলও অটল থাকতে হয়। এটিই হকপন্থীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর নীতি। তাই আল্লাহর এই নীতির প্রতি সাহাবায়ে কেরামকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বলেছেন, "কিন্তু তাড়াহুড়া করছো।"

এছাড়াও কাফের শাসক ও সরকারকে অপসারণ করে তাদের সংবিধানের স্থলে আল্লাহর সংবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আদেশ করেছেন। তাদের সাথে লড়াই করতে বলেছেন। আর আলোচিত হাদীসে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ অন্য সাহাবীদেরকে বললেন, "কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো" তখন তো আল্লাহ তাআলা জিহাদও ফরয করেননি, তাহলে কীভাবে এই হাদীস জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ না-জায়েয হওয়ার দলীল হবে? যারা চক্ষুষ্মান তাদের কাছে বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট। আর হাদীসের ঘটনার মধ্যে কোনো ধরনের "তাড়াহুড়ার ব্যাপারে নিন্দা করা হয়েছে তা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।

তিন. কেউ যদি বলে আমাদের বর্তমান অবস্থা সেই সময়ে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থায় সাথে বেশি মিলে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করেছেন এবং তাঁদেরকে তাড়াহুড়া করতে সতর্ক করেছেন, তাহলে আমরা বলবো:

বিষয়টি একেবারে ঠিক নয়। কেননা উভয় অবস্থার মাঝে স্পষ্ট ও অনেক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, আমরা বর্তমানে জিহাদ করতে সক্ষম। যখন আমাদের সামর্থ্য

হয়েছে তখন আমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়। আমাদের অনেকের জীবন চলে গেলেও আমরা ভয় করি না, আমরা জিহাদের আহ্বান করেই যাবো। যতক্ষণ আমাদের বিশ্বাস জিহাদের সামরিক কাজ আমরা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। সারকথা, আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীতে মুরতাদ কাফের সরকার থাকা এবং এই ইস্যুর ব্যাপারে চুপ থাকার চেয়ে উম্মাহর জন্য বড় কোনো বিপদ নেই। এবিষয়ে আর সংশয় থাকার কথা নয়।

চার. বর্তমান অবস্থায় সুস্পষ্ট অনেক দলীল প্রমাণের মাধ্যমে জিহাদ ফরয হয়েছে। সুতরাং এর বিপরীতে অন্যসব কিয়াস করে শরীয়তের দলীল প্রমাণকে অকার্যকর করে দেয়া এবং শরীয়তের মহান এক বিধানকে অকেজো করে দেয়া কোনো মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয়। বরং এটি ফিতনায় পতিত ব্যক্তিদের কাজ এবং বক্র লোকদের বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

অর্থঃ “যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে, উদ্দেশ্য হলো ফিতনা সৃষ্টি করা এবং সেসব আয়াতের বিপরীত ব্যাখ্যা খোঁজা।” [সূরা আলে ইমরান ০৩:০৭]

তা ছাড়াও এসব কিয়াসের বিপরীতে অনেক মজবুত শারঈ/সহীহ দলীল রয়েছে।

পাঁচ. তাদেরকে আমি বলতে চাই, যদি তোমাদের দলীলকে তোমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, তোমরা নিজেরাই তোমাদের কাজের ক্ষেত্রেও সেই নিন্দিত তাড়াহুড়া করছো। কেননা, তোমরা জিহাদ ও বলপ্রয়োগের কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথকে ছেড়ে দিয়েছো। অথচ আল্লাহ তাআলা এই পথে অগ্রসর হতে আদেশ করেছেন। এর পক্ষে কুরআন সুন্নাহ ও ইজমার অসংখ্য দলীল রয়েছে। এই জিহাদের পথ অনেক দীর্ঘ এবং কষ্টের পথ। যেখানে পদে পদে রয়েছে পরীক্ষার পর পরীক্ষা, আঘাতের পর আঘাত। জিহাদ মানে দুনিয়া ত্যাগ করা, স্বদেশ থেকে দূরে থাকা এবং বন্ধু বান্ধবকে পরিহার করা। তোমরাই তো সমাজের

মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন আনতে এবং নগদ সাহায্য ও বিজয় অর্জন করতে চাচ্ছো। শান্তি-নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েশের জিন্দেগি অতিবাহিত করার জন্য জিহাদের পথকে ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য সহজ পথ-পন্থা গ্রহণ করেছো। যে সকল পথ ও পন্থাকে তোমরা নিজেদের জন্য সহজ মনে করছো সেগুলোই গ্রহণ করেছ। সুতরাং দ্রুত ও তাড়াহুড়া করা যাবে না— তোমাদের এই মূলনীতি মাঠে মারা গেছে। আর এমনটি হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। এতে অবাক হওয়ার কিছু নাই। আমরা সর্বস্থায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করি।

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবীর মাঝে যেই তাড়াহুড়া লক্ষ করেছেন, তার কারণ ছিল ভিন্ন আর আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাড়াহুড়ার কারণ হচ্ছে ভিন্ন। সুতরাং একটিকে আরেকটির সাথে তুলনা করা যাবে না।

হ্যাঁ, মুরতাদ ও কাফের শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাটি তাড়াহুড়া বলে বিবেচিত হবে তখনই, যখন তারা সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা ও পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়ার পূর্বেই এই আন্দোলন শুরু করবে। অর্থাৎ তাদের হাতের নাগালে সকল উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, প্রস্তুতির সকল ব্যবস্থা থাকার পরও তারা যদি কোনো প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই আন্দোলন আরম্ভ করে তাহলে তা তাড়াহুড়া বলে বিবেচিত হবে। যেমন, তাদের কাছে এর চেয়ে আসন্ন ভালো কোনো সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তারা এই ভালো সুযোগের অপেক্ষা না করেই বিরক্ত হয়ে আন্দোলনে বেরিয়ে পড়েছে। এটিও তাড়াহুড়া।

হাতের নাগালে থাকা সম্ভাব্য শরীয়ত সম্মত সকল উপায়-উপকরণ অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা এবং মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ওয়াজিব। এটি অকাট্য দলীলের কাছাকাছি স্তরের মজবুত সব দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত। এই বিধানটি পালনকারী ব্যক্তিদের তাড়াহুড়াকারী বলা যায়। ইন্নাল্লিাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

“প্রতিটি বস্তুর নির্ধারিত সময় রয়েছে” এই আলোচনা করতে গিয়ে পূর্বের বিষয়টি কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে।

সময়ের আগে আন্দোলনে বের হওয়ার আলোচনায় আমি বলেছিলাম, তারা "বিরক্ত হয়ে" বের হয়ে পড়ে। এই কয়েদ (পয়েন্ট) যুক্ত করার কারণ হচ্ছে, ঐ অবস্থাকে ভালো করে স্পষ্ট করা। কেননা আমি আন্দোলনের যেই রূপ তুলে ধরেছি তাতে বিরক্তি ও অসন্তোষ তো থাকবেই, তাতে তো অধৈর্য ও বিরক্তির ভাব থাকবে। কখনো কখনো এই আন্দোলনের মধ্যে থাকবে দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব।

আমরা এখন নিন্দিত তাড়াহুড়ার কারণ নিয়ে আলোচনা করবো।

এক. ধৈর্যের অভাব

ধৈর্যের অভাব মানে, কোনো বাস্তবতা দেখার পর বা কোনো অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পর, বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে, ভালো-মন্দ, সম্ভব-অসম্ভব যাচাই না করে কাজ করে ফেলা। এই মনোভাব লালন করা যে, যেহেতু সমাজের মধ্যে পরিবর্তন আনতেই হবে, সেহেতু যেভাবেই হোক তা করলেই হলো। পরিবর্তনই তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য, যদিও এই পরিবর্তনের ফলে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়। এই আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তাড়াহুড়ার কারণ হয়তো ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা কিংবা জ্ঞানের স্বল্পতা অথবা উভয়টা।

আল্লাহই তাওফীকদাতা। তিনি অধিক জানেন। তিনি অধিক প্রজ্ঞার অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি নেই। আমরা আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে হেদায়াত দান করেন এবং সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

তাড়াহুড়ার নিন্দা সংক্রান্ত হাদীস থেকে শিক্ষা

- والله ليتمن الله هذا الأمر (আল্লাহর কসম! অবশ্যই আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টিকে পরিপূর্ণ করবেন)। অর্থাৎ এই দীনকে, যা দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হয়েছে অর্থাৎ ইসলাম।

- لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه (পথিক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না, এমনকি তার মেষপালের উপর নেকড়ের ভয়ও করবে না):

এখান থেকে বোঝা যায়, মানুষের স্বভাবজাত ভয়ের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে না। হাদীসের অর্থ: সেখানে ইসলাম, ইসলামী শাসন বিস্তারের ফলে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা থাকায় সেই পথিক কোনো চোর, জালিম বা কোনো স্বেচ্ছাচারীর ভয় করবে না।

♦ হাদীসের মধ্যে সংকটপূর্ণ অবস্থায় এবং বিপদাপদের সময়ে অনুসরণকারীদের ধৈর্যধারণের হিকমাহ আলোচনা হয়েছে। আরও আলোচিত হয়েছে, বিপদ-আপদের মধ্যে সুসংবাদের হিকমাহ নিয়েও। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীতে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন খন্দকের যুদ্ধে অর্থাৎ আহযাবের যুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বসরা, ইয়েমেন, পারস্যের বিভিন্ন শহরসহ অন্যান্য ভূখণ্ড জয় লাভ করার সুসংবাদ দিয়েছেন। তেমনি ভয়াবহ বিপদের সময় নেতাদের দায়িত্ব হচ্ছে, ইনসাফ ও হকের সাথে অনুসারীদেরকে সুসংবাদ দিবে, তাদের মনোবল তৈরি করবে, তাদেরকে অবিচল রাখবে।

♦ ঈমানের শোভাযাত্রায় পূর্বসূরি নেককারদেরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ধৈর্য ও বিশ্বাসের পথে সৎপূর্বসূরিদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

♦ এখানে একটি ফিকহী শিক্ষাও রয়েছে, কাউকে যদি হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী কথা বলতে বাধ্য করা হয় আর যদি সে হত্যাকে মেনে নেয়, তাহলে সে অনেক ফযীলতের অধিকারী হবে। যদিও এই অবস্থায় তার জন্য কুফরী কথা বলা জায়েয। এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেও সে যেন কষ্ট সহ্য করে নেয়, এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে তাঁর অপার অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ফায়দা;

(কোমলতার অর্থ, শরীয়তে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, বিপরীত অভ্যাস কঠোরতার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন সংক্রান্ত আলোচনা)

الرفق। অর্থ: সমস্যা নিরসনে কোমলতা, সহজতা অবলম্বন করা।

العنف। অর্থ: العنف। শব্দটি الرفق। এর বিপরীত শব্দ। সমস্যা নিরসনে কঠোরতা ও রূঢ়তা অবলম্বন করা।

শরীয়তের মধ্যে কোমল আচরণের প্রচুর প্রশংসা করা হয়েছে এবং কঠোরতা ও রূঢ়তার নিন্দা করা হয়েছে।

এই ব্যাপারে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে এর অংশ বিশেষ আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিবো। এরপর বিষয়টির শাখাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إن الله رفيق يحب الرفق

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোমল। কোমলতাকে ভালোবাসেন।" (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোমল। প্রতিটা ক্ষেত্রে কোমলতাকে পছন্দ করেন।" (বুখারী, ইবনে মাজাহ)

তিনি আরও বলেন:

إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطى على ما سواه

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোমল। কোমলতাকে ভালোবাসেন, কোমল আচরণ করলে আল্লাহ যতটুকু দান করেন, রূঢ় আচরণ করলে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটুকু দেন না।" (মুসলিম সহ অন্যান্য রেওয়ায়েতের শব্দ)

তিনি আরও বলেন:

من يحرم الرفق يحرم الخير

অর্থ: "যে কোমলতা থেকে বঞ্চিত হয় সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।" (মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ সহ অন্যান্য)

তিনি আরও বলেন:

من يحرم الرفق يحرم الخير كله

"যে কোমলতা থেকে বঞ্চিত হয়, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।" (আবু দাউদের শব্দ)

তিনি আরও বলেন:

قال صلى لله عليه وسلم

من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخيرومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير.

অর্থ: "যে কোমলতার ভাগ্য লাভ করেছে সে তো কল্যাণের ভাগ্য লাভ করেছে। আর যে কোমলতার ভাগ্য থেকে মাহরুম হয়েছে সে তো কল্যাণের ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।" (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদের ইবারত এই রেওয়ায়েতের কাছাকাছি)

তিনি আরও বলেন:

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় যেকোনো ক্ষেত্রে কোমলতা থাকলে কোমলতা তাকে সুন্দর করে তোলে, আর কোনো ক্ষেত্রে কোমলতা না থাকলে তাকে অসুন্দর করে তোলে।" (মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, ইত্যাদি)

এই হলো কোমলতা সংক্রান্ত আলোচনার কিছু মৌলিক হাদীস। এই হাদীসগুলোর কাছাকাছি আরও অনেক হাদীস রয়েছে। এই হাদীসগুলোর প্রেক্ষাপটও রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই হাদীসগুলোর মর্ম ও শিক্ষা, কোমলতা ও কঠোরতার সীমানা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ, এই বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করবো।

কোমলতা, সহজতা, দয়া, অনুগ্রহ এবং কঠোরতা, রূঢ়তা ইত্যাদি সংক্রান্ত বর্ণিত আয়াত এবং হাদীস থেকে আমরা যে সকল শিক্ষা পাই।

এক. ইনসাফ ও প্রজ্ঞার দাবি হচ্ছে, কোমলতা ও কঠোরতাকে তার উপযুক্ত জায়গায় ব্যবহার করা। কোমলতার জায়গায় কোমলতা দেখাবে, আর কঠোরতার জায়গায় কঠোরতা দেখাবে।

দুই. তাই উত্তম চরিত্র হচ্ছে, ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা। আর এটি আত্মশুদ্ধির মূল ভিত্তি। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে আপনি ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ রচিত কিতাব 'আল-ফাওয়ায়েদ' অধ্যয়ন করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ

অর্থ: "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তাঁর সঙ্গে যারা আছেন, তাঁরা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র।" [সূরা ফাতহ ৪৮:২৯]

তিনি আরও বলেন-

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

অর্থ: "তবে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে।" [সূরা মায়েদা ০৫:৫৪]

তিনি আরও বলেন-

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী- তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখ, তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (সূরা আন-নূর ২৪:০২)

তিন. কুরআনে কারীমে এবং হাদীস শরীফে যে কোমলতা, দয়া, অনুগ্রহ, ক্ষমা, মার্জনা, সহজতার প্রশংসা করা হয়েছে সে কোমলতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপযুক্ত ব্যক্তি ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা।

চার. তেমনি কুরআন সুন্নাহ যে কঠোরতা ও রূঢ়তা করতে নিন্দা করে হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি সেই কঠোরতা ও রূঢ়তা অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তির সাথে করা হয়। নচেৎ উপযুক্ত জায়গায় কঠোরতা দেখানো নিঃসন্দেহ প্রশংসনীয় এবং কাম্য। যেমনটি পূর্বোল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে বুঝে আসে।

পাঁচ. তবে কোমলতাই যেন একজন মানুষের প্রতীক হয়। আর কঠোরতা হবে কম এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে।

ছয়. কোমল আচরণ হবে ব্যক্তির প্রথম আচরণ। তবে যখন পরিস্থিতি ভিন্ন হবে তখন কঠোরতা করতে হবে।

বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদীস এসেছে:

إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্বে একটি সিদ্ধান্ত লিখে রেখেছেন তা হচ্ছে, 'আমার রহমত আমার রাগকে অতিক্রম করেছে।' এই বাক্যটি তাঁর কাছে আরশের উপর লেখা আছে।" (এটি হচ্ছে বুখারীর শব্দ)

সহীহ মুসলিমে নিম্নোক্ত শব্দ এসেছে-

لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي

“যখন আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি তাঁর কিতাবে লিখেছেন। সেই কিতাবটি তাঁর কাছে আরশের উপর রয়েছে। লেখাটি হচ্ছে, ‘নিশ্চয় আমার রহমত আমার রাগকে পরাজিত করে’।”

আমার উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাআলার কাজ ও সিফাতের সাথে বান্দার মিল হয়ে যাচ্ছে, কেউ বলতে পারে, এটি তো আল্লাহর কাজের অনুসরণ করা। আমি বলব, আমাদের উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের মধ্যে এই কোমলতা দেখতে খুব ভালোবাসেন। এই বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ পর্যাপ্ত দলীলও রয়েছে। (বিতর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্বতন্ত্র স্থানে রয়েছে। এই বিষয়ে আলোচনা প্রচুর লেখার দাবি রাখে। সুতরাং শুধু এতটুকুর উপর নির্ভর করে কথা বলা যাবে না।

ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন গ্রন্থে উল্লেখ করেন, “জেনে রাখ, কোমলতা প্রশংসনীয়। কোমলতার বিপরীত হচ্ছে কঠোরতা এবং রূঢ়তা। কঠোরতার কারণ হচ্ছে রাগ ক্রোধ ও অভদ্রতা। আর কোমলতা আসে উত্তম চরিত্র ও উত্তম রুচি থেকে। কঠোরতা কখনো হয়ে থাকে ক্রোধের কারণে আর কখনো হয়ে থাকে প্রবল আগ্রহ ও জয়ী হওয়ার মানসিকতা থেকে। ফলে ব্যক্তি অসতর্ক হয়ে যায়, চিন্তা করতে ভুলে যায়, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কোমলতা হচ্ছে একটি ফল, উত্তম চরিত্র ছাড়া এই ফল ধরবে না। আর ব্যক্তি কখনো উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে না যতক্ষণ না সে রাগ ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করবে। আর রাগ ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে ইনসাফের সীমারেখা পর্যন্ত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমলতার প্রশংসা করেছেন এবং গুরুত্ব দিয়েছেন। (এরপর তিনি বেশ কয়েকটি আসারে সাহাবা, হাদীস উল্লেখ করেন)।

ইমাম গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুফিয়ান তাঁর ছাত্রদের লক্ষ করে বলেন, “তোমরা কী জানো কোমলতা কাকে বলে?” তারা বলল, “আবু মুহাম্মদ! আপনি আমাদের বলে দিন।” তিনি বললেন, “কোমলতা হচ্ছে, প্রতিটি বস্তুকে তার

উপযুক্ত জায়গায় রাখা। কঠোরতার জায়গায় কঠোরতা করা, কোমলার জায়গায় কোমলতা করা। তরবারির জায়গায় তরবারি রাখা, চাবুকের জায়গায় চাবুক রাখা।” সুতরাং এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোমলতার সাথে কঠোরতা থাকতে হবে, আবার কঠোরতা সাথে কোমলতা থাকতে হবে। যেমন আরবীতে একটি পঙতি রয়েছে:

ووضع الندي في موضع السيف بالعلا

مضر كوضع السيف في موضع الندى

উপরে তরবারি রাখার জায়গাতে শিশির রাখা যেমন ক্ষতিকর,

তেমনি শিশির রাখার জায়গাতে তরবারি রাখা ক্ষতিকর।

সুতরাং প্রশংসার অধিকারী হতে হলে কঠোরতা ও কোমলতার মাঝে ভারসাম্য রাখতে হবে। যেমন প্রতিটি আখলাকের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। সুতরাং কারো মাঝে যদি কঠোরতা ও রূঢ়তার প্রবণতা বেশি থাকে তাহলে তাকে কোমলতার প্রতি বেশি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাই তো শরীয়ত কোমলতার প্রতি বেশি উৎসাহিত করেছেন। যদিও কঠোরতার জায়গাতে কঠোরতা করা ভালো এবং কোমলতার জায়গাতে কোমলতা ভালো। সুতরাং কখনো যদি কঠোরতা প্রদর্শন জরুরি হয়ে পড়ে, তখন যেন হক আর প্রবৃত্তি হুকুমের ক্ষেত্রে এক হয়ে গেল। যা মধু মিশ্রিত মাখনের মতো সুস্বাদু।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেন, বর্ণিত আছে, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি পত্র লিখে পাঠান। সেখানে আমর ইবনুল আস মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভর্ৎসনা করে লিখেছেন: আপনি কেন এতো ধীরে চলছেন? তখন আমীরে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রত্যুত্তরে একটি পত্র লেখেন। তিনি লেখেন, যে ব্যক্তি ভালো ও কল্যাণকর বিষয় বুঝতে পারে সেই বেশি বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান সে, যে তাড়াহুড়ার সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। আর ব্যর্থ সে, যে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছে। নিশ্চয় যে ধীরে সুস্থে কাজ করে সেই সঠিক কাজ করে । আর যে তাড়াহুড়া করে কাজ করে সে ভুল

কাজ করে। কিংবা অধিকাংশ সময়ে ভুল করে। কোমলতা যদি কারো উপকারে নাও আসে তবে উত্তমরূপে কাজ না করলে সেটি তার অবশ্যই ক্ষতি করবে। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে না সে কখনো সুউচ্চ আসন লাভ করতে পারে না।

এক্ষেত্রে আমরা আবু আউন আনসারীর কথাটি উল্লেখ করছি তিনি বলেন :

“মানুষ যেকোনো কঠিন কথা বলে, তার স্থানে অবশ্যই এমন কোনো নম্র কথা থাকে যা তার এই কঠিন কথা বুঝানোর জন্য যথেষ্ট হবে।”

ইমাম আবু হামজা কুফি রহিমাহুল্লাহ বলেন, নিরুপায় না হওয়া ছাড়া তুমি কাউকে খাদেম হিসেবে গ্রহণ করো না। কেননা, প্রতিটি মানুষের সাথেই একটি শয়তান আছে। জেনে রাখ! কঠোরতা ও রূঢ় আচরণ করার সময় খাদেমরা তোমার যেই পরিমাণ উপকার করবে এর চেয়ে বেশি উপকার করবে যখন তুমি তার সাথে কোমল আচরণ করবে।

ইমাম হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুমিন অনেক ধীর স্থিরতা ও চিন্তার সাথে কাজ করে। সে রাতের বেলায় লাকড়ি কুড়ানো ব্যক্তির মতো নয়, যে ভালো-মন্দ যাচাই না করে যা পায় তা নেয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় উলামায়ে কেরাম কোমলতার প্রশংসা করেছেন। কেননা কোমলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশংসিত ও উপকারী। যদিও কখনো কখনো কঠোরতা ও রূঢ় আচরণ করারও প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু সেটাও নগণ্য। বিচক্ষণ সে, যে কোমলতার ক্ষেত্র ও কঠোরতার ক্ষেত্রের মাঝে পার্থক্য করতে পারে; কঠোরতার সময় কঠোরতা করে আর কোমলতার সময় কোমল আচরণ করে। অবিচক্ষণ ব্যক্তির সামনে যদি পরিস্থিতি অস্পষ্ট হয়, সে কঠোরতা করবে না কোমলতা দেখাবে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারে, সেক্ষেত্রে সতর্কতামূলক কোমলতা দেখানোই উচিত। কেননা কোমলতা দেখালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলতা পাওয়া যায়।” (এখানে গাজ্জালী রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য শেষ হলো।)

সাত. নিন্দিত কঠোরতা ও অশ্লীল কথা বা কাজের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

يا عائِشَةُ عَلَيْكِ بالرِّفْقِ وإيّاكِ والعُنْفَ والفُحْشَ قالَتْ أوَلَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟ قالَ أوَلَمْ تَسْمَعِي ما قُلتُ؟ رَدَدْتُ عليهم فيُسْتَجابُ لي فيهم ولا يُسْتَجابُ لهمْ فِيَّ

অর্থ: "আয়েশা! তুমি কোমলতাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। কখনো কঠোরতা এবং অশ্লীল কথা কিংবা কাজ করো না।" আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, "আপনি কি তাদের কথা শুনেননি?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কি আমার কথা শুনোনি? তাদের কথা তাদেরকে ফিরিয়ে দিলাম। তাদের ক্ষেত্রে আমার বদ দোয়া কবুল করা হবে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তাদের কথা কবুল করা হবে না।" [বুখারী, ৬০৩০]

সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে:

يا عائِشَةُ لا تَكُونِي فاحِشَةً فَقالَتْ ما سَمِعْتَ ما قالوا؟ فَقالَ أَوَليسَ قدْ رَدَدْتُ عليهِمِ الذي قالوا قُلتُ وَعلَيْكُم

"আয়েশা! তুমি অশ্লীল হয়ো না। তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, "তারা কী বলেছে আপনি কি শুনেননি?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তারা যা বলেছে আমি কি তা তাদেরকে ফিরিয়ে বলিনি? আমি বলেছি, তোমাদের কথা তোমাদের উপর পতিত হোক।" [মুসলিম, ২১৬৫]

মুসলিমের অন্য রেওয়ায়েতে আছে–

ففطنت بهم عائشة فسبتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش

তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাদের কথা বুঝে ফেললেন, তখন তিনি তাদেরকে গালি দিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

“আয়েশা! থামো থামো (এমন বলো না)। কেননা আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা ও অশ্লীলতার ভান করাকে ভালোবাসেন না।” [মুসলিম, ২১৬৫]

একই হাদীস সহীহ ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনায় এসেছে;

ولا كان الفحش في شيء إلا شانه.

“কোনো বস্তুর মধ্যে অশ্লীলতা থাকলে অশ্লীলতা তাকে অসুন্দর করে ফেলে।” [সহীহ ইবনে হিব্বান]

আলোচিত হাদীসগুলোর মাঝে শব্দের ভিন্নতার ব্যাখ্যা হলো এমন;

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে فحش শব্দটি বলেছেন। এমনটি হওয়াই যৌক্তিক।

হয়তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম عنف ও فحش উভয় শব্দই বলেছেন। তাই একেক রেওয়ায়েতে একেক ভাবে এসেছে।

আবার হতে পারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শব্দ বলেছেন। কেউ হুবহু শব্দ মুখস্থ করেছে, আর বাকিরা শব্দের অর্থ ধারণ করে অন্য শব্দ দিয়ে রেওয়ায়েত করেছেন। সে সকল সাহবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু কতইনা সম্মানিত যারা শব্দের অর্থ সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

অশ্লীলতার ভিতরে এক ধরনের কঠোরতা আছে। কেননা অশ্লীল কথা অনুপযুক্ত জায়গায় কঠোর কথাই।

যদি উপযুক্ত জায়গায় প্রয়োগ করা হয় — যদিও এর ক্ষেত্র অনেক কম — তাহলে এমন কথা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অশ্লীল বা কঠোর হবে না যদিও শব্দগত দিক থেকে এটি অশ্লীল কথা হয়। কেননা হাদীসের মধ্যে এসেছে-

من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا

অর্থ: "কোনো ব্যক্তি যদি জাহিলিয়্যাতের মতো বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করে তোমরা তাদেরকে স্পষ্টভাষায় বলে দাও, তোরা তোদের বাবার লজ্জাস্থান কামড় দিয়ে ধর।" [আহমাদ, ২১২৩৪]

তেমনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হুদাইবিয়ার সময় উরওয়া ইবনে মাসউদ আস সাকাফীকে বলেছেন-

امصص بظر اللات

অর্থ: "তুই 'লাত'-এর লজ্জাস্থান চোষ।" [সহীহ বুখারী ২৭৩১]

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে বলেছেন। কিন্তু এই অশ্লীল কথা উপযুক্ত জায়গায় হওয়ায় এটি অশ্লীল কথা নয়। কারণ, এ কথার মাঝে প্রজ্ঞা বিচক্ষণতা এবং সততা নিহিত রয়েছে। উপযুক্ত হওয়ায় এটি কঠোরতাও নয়। তবে এমনটি খুব কম ঘটে থাকে। সীমিত পরিসরে প্রয়োজন অনুপাতে বলা যাবে। খুব সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আট. সর্বক্ষেত্রে, প্রতিটি বস্তুর সাথে এমনকি চতুষ্পদ জন্তুর সাথেও কোমল আচরণ করতে হবে।

শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন;

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুর সাথে অনুগ্রহের আচরণ করতে আদেশ করেছেন। সুতরাং কাউকে হত্যা করতে হলে সুন্দর করে হত্যা করো। যখন তোমরা জবাই করবে তখন সুন্দর করে জবাই করো। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার দিয়ে নেয় এবং জবাইকৃত পশুকে কষ্ট কম দেয়।" [সহীহ মুসলিম, ১৯৫৫]

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض

وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل

অর্থ: "যখন জমিন উর্বর হবে অর্থাৎ জমিনে ঘাস থাকবে তখন তোমরা সফরকালে উটকে জমিন থেকে ঘাস খাওয়ার সুযোগ দাও। আর যখন জমিনে ঘাস থাকবে না তখন তোমরা সফরকালে দ্রুত জায়গা অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছে যাও। যাতে ঘাস খেতে না পারায় ক্লান্ত হওয়ার কারণে উটের মগজ শুকিয়ে না যায়। যখন তোমরা রাত্রে যাত্রা বিরতি করবে তখন তোমরা রাস্তায় ঘুমিও না। কেননা রাস্তা চতুষ্পদ জন্তুর হাঁটার পথ এবং বিভিন্ন কীটপতঙ্গ সহ সাপ বিচ্ছু ইত্যাদির রাতে বিশ্রামের জায়গা।" [সহীহ মুসলিম ১৯২৬]

অন্য একটি মুরসাল রেওয়ায়েতে এসেছে

إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোমল। কোমলতাকে ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন। কোমল আচরণ করলে এমন নেয়ামত দান করেন যা কঠোর আচরণ করলে দান করেন না। যখন তোমরা এই সকল বোবা চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করবে তখন প্রাণীগুলোর যাত্রা বিরতির সময় যাত্রা বিরতি দাও। যদি জমিন অনুর্বর হয় তাহলে উটের মগজ যেন শুকিয়ে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকো। তোমরা রাত্রে সফর করো। কেননা রাত্রে যত দ্রুত সফর করা যায় দিনের বেলায় ততটা যায় না। তোমরা রাত্রে রাস্তায় যাত্রা বিরতি দিও না এবং তাতে

বিশ্রাম করো না। কেননা রাস্তা চতুষ্পদ জন্তুর হাঁটার পথ এবং সাপের বিশ্রামের জায়গা।"

মুআত্তায়ে মালেকে বনি ইসরাঈলের ব্যভিচারিণীর ঘটনা তো প্রসিদ্ধ। যিনি কুকুরকে পানি পান করিয়েছেন, এর বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন।

প্রাণীদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমল আচরণ করার বিষয়টি প্রসিদ্ধ।

বর্তমান সমাজের লোকেরা প্রাণীদের সাথে কোমল আচরণ করার বিষয়টি নিয়ে পরস্পর গর্ব করে থাকে। অধিকাংশ পশ্চিমারা মনে করে তারাই এই আদর্শের আবিষ্কারক ও জনক। অথচ তারা জানে না এই ক্ষেত্রে তারা যে কল্যাণ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত লাভ করেছে সেটি তো নবুওয়াতের একটি ঝলক এবং ইসলামের কিরণের চিহ্ন মাত্র। আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

নয়. প্রজাদের সাথে কোমল আচরণ করা। প্রজাদের জন্য সহজ করা, তাদের খেদমত করা, তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করা এবং তাদের শান্তি ও কল্যাণের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে এই বিষয়ে

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فارفق بهم فارفق به

অর্থ: হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেন। "হে আল্লাহ! যারা আমার উম্মতের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাদের সাথে কঠোরতা করে, আপনিও তাদের প্রতি কঠোরতা করুন। আর যারা আমার উম্মতের কোনো দায়িত্ব নেয়ার পর তাদের সাথে কোমল আচরণ করবে আপনিও তাদের সাথে কোমল আচরণ করুন।" [সহীহ মুসলিম]

দশ. কারো প্রতি সহজ করাও একধরনের কোমলতা। এই মূলনীতি একজন মুজাহিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচুর অসিয়ত রয়েছে। তিনি যুদ্ধে পাঠানোর সময় প্রতিনিধি, নেতাদেরকে এবং দাঈদেরকে বলতেন-

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

অর্থ : "তোমরা সহজ করো কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, দুঃসংবাদ দিও না।"

কেননা, মুজাহিদের মৌলিক কাজ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি মানুষদেরকে আহ্বান করা, মানুষদেরকে পথ প্রদর্শন করা, তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসা, তাদেরকে ভালোবাসা এবং তাদের মন জয় করা। তাই মুজাহিদের জন্য কোমলতা খুব জরুরি বিষয়। একজন মুজাহিদের ভিতরে যে পরিমাণ কোমলতা থাকবে তার মাঝে তত বেশি কল্যাণ থাকবে এবং সে তত বেশি সফল হতে পারবে। হাদীসের মধ্যে এসেছে-

بعثت بالحنفية السمحة

অর্থ: "আমাকে সহজ (একনিষ্ঠ) ইসলাম ধর্ম দিয়ে পাঠানো হয়েছে।" (তাবরানী, মুসনাদে আহমদ)

উলামায়ে কেরাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাওহীদের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা এবং শরীয়তের ক্ষেত্রে সহজ করা উচিত। **السماحة** অর্থ: সহজ করা, কোমল আচরণ করা, কঠোরতা না করা, চাপাচাপি না করা, বলপ্রয়োগ না করা, কষ্ট না করা — এই সবগুলোরই কাছাকাছি অর্থ।

হাদীসের মধ্যে এসেছে-

رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى

অর্থ: "আল্লাহ তাআলা রহম করুন এমন ব্যক্তির উপর যে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এবং ফায়সালা করার সময় কোমল আচরণ করে।" (বুখারী)

বর্তমানের বক্র হৃদয়ের অধিকারীরা সহজতা ও কোমলতার শব্দটি মুখে জপতে থাকে। তারা বলতে থাকে, ইসলাম ক্ষমা, মার্জনা ও শান্তির ধর্ম। তবে তারা ইসলামের বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' অর্থাৎ শত্রুতা-মিত্রতার মূলনীতিকে মুছে ফেলা। কাফেরদেরকে ঘৃণা করা, তাদের সাথে শত্রুতা করা, তাদেরকে অস্বীকার করা এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার হুকুমকে রহিত করে দিতে চায়। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। আমীন।

আর আমরা মুসলিম, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী এবং মুজাহিদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সহজতা কোমলতা ক্ষমা ও মার্জনার বার্তা নিয়ে এসেছেন তা আমাদের ভালো করে জানা আছে। কোমলতার সীমারেখা এবং কোমলতার লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাদের জানা আছে আলহামদুলিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ ও ক্ষমা কামনা করি। তোমার কাছে সর্বদা তাওফীক কামনা করি।

ইনশাআল্লাহ আমরা সামনের অধিবেশনে জিহাদের ময়দানে শরীয়তের কী কী কোমলতা আছে তা নিয়ে আলোচনা করবো। কোমলতার নির্দেশনাগুলো সামনে রেখে কাফেরদের সাথে আচরণবিধি কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনা করবো।

ষষ্ঠ মজলিস

জিহাদ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে মুআমালায় ইসলামী শরীয়তের উদারতা ও মহানুভবতার সমুজ্জ্বল কিছু দৃষ্টান্ত

সারা পৃথিবীর বুকে সমস্ত মানুষের জেনে রাখা উচিত যে, একজন কাফের হলো সবচেয়ে বড় অপরাধী ও পাপী। কারণ, সে কুফরী অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ জঘন্য কাজগুলো করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাও আবার তার মহান স্রষ্টার সাথে, যিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে। এজন্য একজন কাফের অকল্পনীয় অসহনীয় ও অভাবনীয় কঠিন শাস্তির চূড়ান্ত পর্যায়ের হকদার। যেহেতু আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দীনকে অস্বীকার করা সবচেয়ে বড় অন্যায় ও পাপ। এজন্য কোনো কাফের যখন ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী ঝাণ্ডাকে নিঃশেষ করে দিয়ে শয়তানী ও তাগুতী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে, তাদের উপর জুলুম অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টিমরোলার চালায়, তাদেরকে হত্যা করে, তখন সে চূড়ান্ত পর্যায়ের অপরাধী, পাপাচারী ও ঘোরতর অবাধ্য হিসেবে পরিগণিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

অর্থ: "যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অন্যদের ফিরিয়ে রেখেছে আমি তাদের আযাবের উপর আযাব দিবো, যেহেতু তারা জমিনে ফাসাদ করে বেড়াতো।" **[সূরা নাহল, ১৬:৮৮]**

এজন্য কাফের পৃথিবীর বুকে চূড়ান্ত পর্যায়ের শাস্তির উপযুক্ত। তাদের এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। আর আখিরাতের শাস্তি তো আছেই। ফলে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রতিটি কাফের মর্যাদাহীন, অসম্মানিত। ঠিক তেমনি তার সম্পদ, সন্তান-সন্ততি স্ত্রী সবকিছু অমর্যাদাবান, তুচ্ছ, মূল্যহীন। তাই তাদেরকে হত্যা করা হবে তাদের মাল গনীমত হিসাবে গণ্য হবে। তাদের নারীদের

বন্দী করে দাসী বানানো হবে। এ সংক্রান্ত বিধানের স্বতন্ত্র আলোচনা ফিকহের কিতাবাদিতে পাওয়া যায়। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের চুক্তি থাকলে ভিন্ন মাসআলা। একটি সম্মানিত প্রাণীও তাদের থেকে অনেক উত্তম। আল্লাহ তাআলা এদের ব্যাপারে বলেন-

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ

অর্থ: “অবশ্যই আমি জিন ও মানবজাতির মধ্য হতে বহু লোককে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করেছি,তাদের অন্তর আছে কিন্তু তারা তা দিয়ে বুঝে না এবং তাদের কান রয়েছে কিন্তু তারা কান দিয়ে শুনে না ওরা হলো চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়েও আরও নিকৃষ্ট, এরাই হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের গাফেল।” [সূরা আরাফ ০৬:১৭৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

অর্থ: “আপনি ধারণা করেছেন যে তাদের অধিকাংশই শুনছে অথবা বুঝছে এরা তো হলো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও অধিক পথ ভ্রষ্ট।” [সূরা ফুরকান ২৫:৪৪]

তিনি আরও বলেন-

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থ: “আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম প্রাণী হলো যারা কুফরী করে ঈমান আনে না।” [সূরা আনফাল ০৮:৫৫]

কাফের হলো অপবিত্র নাপাক, মূল্যহীন ব্যক্তি যার কোনো নিরাপত্তা নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা শিরক ও আহলে শিরককে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছেন। তাদের

সাথে আল্লাহ তাআলা বারাআত ঘোষণা করেছেন। তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা চাপিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

অর্থ: "আহলে কিতাবদের যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা-কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দীনকে নিজের দীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে।" [সূরা আত-তাওবাহ্ ০৯:২৯]

তিনি তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। তাই তাদের ভেতর বাহির উভয়টাকে কুফরের নাপাকিতে ভরে দিয়েছেন। তাইতো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে তাদেরকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন। তাদের ভেতর বাহির পুরোটাই কলুষতার কারণে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ, ঘোরতর শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কূটকৌশল করা তাদের চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাইরের কোনো ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট কামনায় কোনো রকম ত্রুটি করে না। যাতে তোমরা কষ্ট পাও তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখ থেকেই আক্রোশ বের হয়ে

গেছে। আর তাদের অন্তরে যা-কিছু (বিদ্বেষ) গোপন আছে, তা আরও গুরুতর। আমি আসল বৃত্তান্ত তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম যদি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও।" [সূরা আলে-ইমরান ০৩:১১৮]

তিনি আরও বললেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

অর্থ: "হে মুমিনগণ! মুসলিমদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। তোমরা কি আল্লাহর কাছে নিজেদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ নিজেদের শাস্তিযোগ্য হওয়া সম্পর্কে) সুস্পষ্ট প্রমাণ দাঁড় করাতে চাও?" [সূরা আন-নিসা ০৪:১৪৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! মুশরিক সম্প্রদায় আপাদমস্তক অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের নিকটেও না আসে।" [সূরা আত-তাওবাহ্ ০৯:২৮]

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন-

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থ: "তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই তারা (আপাদমস্তক) অপবিত্র। আর তারা যা অর্জন করছে তজ্জন্য তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।" [সূরা আত-তাওবাহ্ ০৯:৯৫]

এসব কিছু সত্ত্বেও আল্লাহর মহত্ত্ব ও মহানুভবতার কারণে ইসলামী শরীয়ত মানবতার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে। কারণ তার দৃষ্টিভঙ্গি হলো মানুষ - মানুষ হওয়ার কারণে সম্মানিত।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

অর্থ: "বাস্তবিকপক্ষে আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমার বহু মাখলুকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" [সূরা বনি-ইসরাঈল ১৭:৭০]

কাফেরদের সাথে লড়াই করা, তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করার ক্ষেত্রে এসব উদারতা ও মহানুভবতা প্রকাশ পায়, যেমন হত্যার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করা, চেহারায় মারার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চেহারায় আঘাত না করা, গালিগালাজ না করা, মানবতাকে সম্মান করা, বন্দীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করা, এছাড়াও এর রয়েছে আরও অনেক নিয়মনীতি যার কিছু উদাহরণ আমরা উল্লেখ করছি। তাছাড়া মৃত্যুর পরেও আছে অনেক বিষয়। যেমন, সুন্দর করে মাটিতে লাশ দাফন করা, তাদের মরদেহকে সম্মান করা, কোনো অঙ্গ বিকৃতি সাধন না করা।

কাফেরদের চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন ও হঠকারিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি সহনশীল আচরণ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে বহু কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাদের আযাব না দেওয়া নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন, যতক্ষণ না রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে তাদের উপর আযাব নাযিলের সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যায়; যতক্ষণ নবীদের মাধ্যমে তাদের কাছে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ নিষেধ সংবলিত আয়াত সমূহ না পৌঁছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

অর্থ: “আমি কখনও কাউকে শাস্তি দেই না, যতক্ষণ না (তার কাছে) কোনো রাসূল পাঠাই।” [সূরা বনি-ইসরাঈল ১৭:১৫]

এছাড়া তাদের অনেককে দীর্ঘ জীবন দান করেন। আল্লাহর দিকে ফিরে আসার জন্য সুযোগের পর সুযোগ দিতেই থাকেন। বান্দার প্রতি সহিষ্ণু হয়ে। তাদের সতর্ক করার জন্য। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা সতর্ক করাকে পছন্দ করেন। আর এটা হলো আল্লাহ্ তাআলার মহত্ত্ব ও সহিষ্ণুতার সর্বোচ্চ প্রমাণ।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَعْذَرَاللَّهُ إلى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَه حتّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً

অর্থ: “আল্লাহ্ যার আয়ু দীর্ঘ করেছেন, এমনকি তাকে ষাট বছরে পৌঁছে দিয়েছেন তার ওজর পেশ করার সুযোগ রাখেননি।” [বুখারী, ৬৪১৯]

তিনি আরও বলেন-

وَليسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ العُذْرُمِنَ الله مِن أَجْلِ ذلكَ أَنْزَلَ الكِتابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ

অর্থ: “আল্লাহ্ তাআলার থেকে অধিক সতর্ককারী ও ওজর পছন্দকারী কেউ নেই, এজন্য আল্লাহ্ তাআলা কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন।” [বুখারী, ৪৬৩৪ মুসলিম, ২৭৬০]

আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং নিজেই তার আনুগত্যশীল মুমিন বান্দাদেরকে অনেক কাফেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তারা হত্যার উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও। তা করা হয় একমাত্র তাদেরকে ঈমান গ্রহণের সুযোগ দিতে। এই আশায় যে, তারা আল্লাহর দরবারে তাওবা করে মুসলমান হয়ে যাবে, এক আল্লাহর ইবাদত করবে, যার কোনো শরীক নেই। কখনো হত্যা করা হয় না এই আশায় যে, তাদের ছেলে সন্তান এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। যেমন, যাদেরকে ইসলামী শরীয়ত হত্যা করতে নিষেধ করেছে তাদের মধ্যে আছে- নারী,

শিশু, বৃদ্ধ ইত্যাদি। কখনো দেখা যায় একজন হত্যার উপযুক্ত কাফেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় শুধু সে ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তার সম্প্রদায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসবে এই আশায়। তার বাস্তব নমুনা হলো, ঐ বন্দী কাফের যাকে কোনো ধরনের মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়।

এসব কিছু হলো ইসলামের মহানুভবতা, দয়ার্দ্রতা, তাও আবার তার চিরস্থায়ী শত্রুর সাথে। প্রকৃতপক্ষে, এসব কিছুই হলো আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত ঘোষণার প্রতিফলন।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

অর্থ: “আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।” [সূরা আম্বিয়া ২১:১০৭]

এখন আমি আপনাদের সামনে কাফেরদের সাথে লেনদেনের বিধি-বিধানের কিয়দংশ আলোচনা করব, যাতে মুসলিম ও কাফেরদের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে, যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম তাওফীকদাতা।

০১. মুসলিম, কাফের নির্বিশেষে সবার সাথেই ন্যায়-ইনসাফ করার আদেশ দিয়েছে ইসলাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থ: “হে মুমিনগণ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর (বিধানাবলী পালনের) জন্য সদাপ্রস্তুত (এবং) ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী এবং কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করে চলো।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।” [সূরা আল-মায়িদাহ ০৫: ০৮]

একজন কাফেরের জন্য যতদূর হক সাব্যস্ত হয়েছে আমরা অবশ্যই তা স্বীকার করি এবং তা আদায় করতে সচেষ্ট থাকি। কারণ, এই হক তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এই কথাগুলোর সাথে আগের কথাগুলো মিলিয়ে দেখুন। যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, তথা “কাফের অসম্মানিত।” তাহলে পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলাম কত উদার, মহানুভব, দয়ার্দ্র! তবে, ইনসাফের এই মূলনীতির পুরোটাই সাব্যস্ত হবে জিম্মি কাফেরের ক্ষেত্রে, অথবা যার আমান (নিরাপত্তা) রয়েছে, যার সাথে সন্ধি চুক্তি আছে। আর হারবি কাফের, যে নাকি অসম্মানিত তার ক্ষেত্রেও ইনসাফের এই মূলনীতির অনেক কিছু প্রকাশ পায়। কারণ, তার ক্ষেত্রে ইনসাফ তো হচ্ছে তাকে হত্যা করে ফেলা, এরপর তার প্রতি ইনসাফ করে হত্যা না করা সেটাতো ইনসাফের সর্বস্তর। কারণ ইহসানের সাথে যে ইনসাফ হয় সেটাকেই ফজল বলা হয়। এই ইহসানের মাধ্যমে তার প্রতি দয়াশীল হয়ে তাকে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে।

আহ! কতইনা ইনসাফপূর্ণ ও মহত্ত্বপূর্ণ ধর্ম ইসলাম।

০২. আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ইনসাফপূর্ণ যুদ্ধের, তথা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ফয়সালা করেছেন। বাস্তবতা হলো, তার পুরোটায় ইনসাফে ভরা, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হতে পারে। ইসলামী জিহাদের সকল কার্যক্রম ন্যায়-নীতির আদলে হয়ে থাকে।

জিহাদ যদি হয় প্রতিরোধমূলক তাহলে তো জিহাদের মাঝে ইনসাফ থাকার বিষয়টি নিয়ে মুসলিম অমুসলিম কারো কোনো দ্বিমত নেই। প্রতিরোধ জিহাদের ন্যায়-ইনসাফের ব্যাপারে সবারই স্বীকৃতি আছে। আর যদি জিহাদ হয় আক্রমণাত্মক জিহাদ; সেটিকে ইসলামী শরীয়তে جهاد الطلب বলা হয়। মানুষ চাইলে যেন ইসলাম গ্রহণ করতে পারে এমন অধিকার পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এ যুদ্ধ করা হয়।

যতদিন পর্যন্ত কাফেরদের কর্তৃত্ব, তাদের বিচার ব্যবস্থা পৃথিবীর বুকে চলবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ নিজস্ব ইচ্ছাধিকার এবং ইসলাম গ্রহণের স্বাধীনতা পাবে না। যেদিন তাগুতি রাজত্ব ও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণবিচূর্ণ হবে সেদিনই মানুষের ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছাধিকার ও স্বাধীনতা এ ধরায় নতুন করে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। বলা বহুল্য, তা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্যই আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হলো-

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

অর্থ: "তোমরা ফিতনা নির্মূল হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করে যাও।" [সূরা বাকারা ০২:১৯৩]

ফিতনা বলা হয়, কাফের মুশরিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যা দিয়ে তারা মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় চলতে বাধা দেয়।

সুতারাং এই ধরনের জিহাদ একমাত্র আল্লাহর পথে আল্লাহর জন্য। তা হবে দীন ও শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায়। সে জিহাদে থাকবে একনিষ্ঠতা ও স্বচ্ছতা। সে জিহাদের লক্ষ্য, গন্তব্য এবং সকল কার্যক্রম হবে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথ ও পন্থায়। আর তা হলো, ফিকহে ইসলামীতে আলোচিত ইসলামী জিহাদের সকল বিধানাবলী।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্য কখনো রাজত্ব ও সম্পদ দখল করা হতে পারে না, তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য মানুষকে দাস বানিয়ে বশীভূত করা নয়— যদিও তা পরোক্ষভাবে পুরোপুরি অথবা আংশিক ঘটে থাকে যখন অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু তারা যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আল্লাহর পেয়ারা বান্দা মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ের মতো জঘন্য কাজ শুরু করে দেয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা কাফেরদেরকে বন্দী করে গোলাম বানিয়ে রাখা, তাদের সহায়-সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া— সবকিছু হালাল হয়ে যায়। প্রথম আলোচিত বিষয় (অর্থাৎ যুদ্ধের মৌলিক ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য রাজত্ব এবং সম্পদ

দখল) আর অবাধ্যদের থেকে যুদ্ধের ময়দানে গনীমত লাভ করা এক জিনিস নয়, বরং উভয়ের মাঝে সুস্পষ্ট ফারাক রয়েছে।

মনে রাখা চাই, ইসলামে যুদ্ধ শুধু কোনো দল, জাতি বা গোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্ব করার জন্য তো নয়ই, এমনকি মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার জন্যও নয়।

বরং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, ফিতনা নির্মূল করা, জুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করা, মানব জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা, দুর্বলদের উদ্ধারে এগিয়ে আসা। সর্বোপরি তার লক্ষ্য হলো: ইসলামকে প্রচার-প্রসার করা, ইসলামী ঝাণ্ডা পৃথিবীর বুকে উড্ডয়ন করা, ইসলামী সমাজ-রাষ্ট্রে ইসলামী খেলাফত বাস্তবায়ন করা। এই জন্যই জিহাদে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি বলতে কিছুই নেই। পাপাচার, ব্যভিচারসহ খেয়ানতের কোনো ধরনের নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না তাতে। বরং পুরোটাই থাকে শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, মহানুভবতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার মহান গুণে গুণান্বিত। দীনের আনুগত্য করা, দীনকে আঁকড়ে ধরা ও উত্তম আখলাকের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় জিহাদের উত্তম আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। যার সত্যতা পাওয়া যায় এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থ: “যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তবে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।” [সূরা আল-বাকারা ০২:১৯০]

প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমাদের সম্মানিত করেছেন, মহান দীন ইসলামের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

০৩. হারবিদের মধ্য থেকেও কিছু শ্রেণিকে হত্যা করা নিষেধ।

ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কাফের হারবিদের মধ্য থেকেও অনেককে হত্যা করতে নিষেধ আছে। তবে খেয়াল রাখা চাই যে, এখানে হারবি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কাফের যাদের সাথে আমাদের ذمة. صلح. أمان তিন চুক্তির কোনো চুক্তি নেই।

যেমন ইসলামী শরীয়ত নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছে। এটা ইসলামী শরীয়তের অকাট্য বিধান, উলামায়ে কেরামের ইজমাও রয়েছে এক্ষেত্রে। ইসলাম আরও নিষেধ করেছে বৃদ্ধ, পাদরি ও সন্ন্যাসীদেরকে হত্যা করতে যারা গির্জায় পড়ে থাকে; অসুস্থ, বিকলাঙ্গ ও দিন মজুরদেরও হত্যা করেতে নিষেধ করেছে।

পাশাপাশি ঐসকল লোককেও যারা যুদ্ধ বা লড়াই করে না, আল্লাহর পথে বাধা দেয় না, কোনো ধরনের আক্রমণও করে না। যাদের অবস্থা হলো তারা নিজেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না, কোনো ধরনের সহযোগিতাও করে না, চাই তা আর্থিক ভাবে হোক অথবা কবিতা আবৃত্তি করা, গান করা, যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জবান দিয়ে হোক।

০৪. উত্তমরূপে হত্যা করা

কাফেরকে হত্যার সময় উত্তম রূপে হত্যা করাও ইসলামী শরীয়তের এক সুন্দরতম দিক, যাতে রয়েছে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার প্রামাণ্যতা।

এই হুকুম দেওয়া হয়েছে মুসলমানদের অন্তর থেকে সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করতে, শুধু কাউকে হত্যা ও রক্তপাত করে মজা লাভ করার মতো তুচ্ছ ও হীন মানসিকতা দূর করতে। তারই সাথে মুসলমানদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল করা যে, আমরা যাকে হত্যা করবো একমাত্র আল্লাহর জন্যই করবো, নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য না।

আর আমরা তাকে হত্যা করি, কারণ তার জন্য হত্যা ছাড়া অন্য কোনো ঔষধ নেই, যেমন; ছ্যাঁক বা অপারেশন যেটা নাকি সর্বশেষ ঔষধ হয়ে থাকে। তবে এসব কিছু থেকে ইসলামের দয়া ও সহানুভূতির পরিপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ হয়। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إنَّ اللّهَ كَتَبَ الإحْسانَ على كُلِّ شيءٍ فَإذا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ وإذا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْح وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

অর্থ: “নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সবকিছুতেই নিজের জন্য ইহসানের গুণকে অবধারিত করে নিয়েছেন। তাই যখন তোমরা হত্যা করবে সর্বোত্তম ভাবে হত্যা করবে, আর যখন জবাই করবে তখন সর্বোত্তম ভাবে জবাই করবে, আর তোমাদের প্রত্যেকেই যেন ছুরিকে ধার দিয়ে নেয় যাতে পশু আরাম পায়।” [সহীহ মুসলিম, ১৯৫৫]

০৫. পরাজিতদের সাথে দয়া।

ইহসান ও ইনসাফপূর্ণ আচরণের পদ্ধতিসমূহের একটি হলো, তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হবে। আলেমগণ বলেন, প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হবে। না মানলে জিযিয়া দিতে বলা হবে। যদি তাও না মানে তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে এবং হত্যা করা হবে। তবে যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন মহিলা, শিশু, বিকৃত মস্তিষ্ক, অতিবৃদ্ধ, দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ, অন্ধ, এমন সন্ন্যাসী যে সবকিছু থেকে নির্লিপ্ত ও উপাসনালয়ে একান্তে ইবাদতরত— তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ দেয়া হবে। তবে কোনো মুসলিম এদের হত্যা করলে তাকে ইস্তেগফার করতে বলা হবে। যেমন দাওয়াত পৌঁছেনি, এমন ব্যক্তির হত্যাকারীকে ইস্তেগফার করতে বলা হয়। কিন্তু এরা যদি মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয় তাহলে তাদের হত্যাকারীর উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে। সন্ন্যাসী পুরুষ ও মহিলা উভয়েই স্বাধীন থাকবে। (মুখতারে খলিল ইবনে ইসহাক আল-মালিকী)

الفواكه الدواني شرح رساله ابن ابي زيد القيرواني কিতাবে রয়েছে: সন্ন্যাসীসহ উপরে যাদেরকে হত্যা করা জায়েয নেই বলা হয়েছে, তাদের জন্য তাদের কিংবা অন্য কাফেরদের সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী রেখে দেয়া হবে। যদি কারো সম্পদ না থাকে, তবে তাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। আর মুখতাসারে খলিলের সূত্রে পূর্বেই বলা হয়েছে, নিরাপত্তা লাভের পূর্বে এদের কাউকে কোনো মুসলিম হত্যা করলে তার উপর তওবা ছাড়া আর কিছুই আবশ্যক হবে না। তবে নিরাপত্তা লাভের পর হত্যা করলে সেক্ষেত্রে রক্তপণ আর সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হবে— যা তাদের ধর্মীয় লোকদেরকে দিতে হবে।

০৬. বন্দীদের সাথে আচরণ

ইসলামে বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করার বিধান রয়েছে। যেমন, তাকে মুক্তিপণ নেয়া ছাড়াই মুক্তি দিয়ে দেয়া। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বন্দীর প্রতি অনুগ্রহ করা, সে এবং তার কওম যাতে ইসলামের দিকে ঝুঁকে সেই পথ উন্মোচিত করা ইত্যাদি। সাধারণভাবে বন্দীর সাথে সদয় আচরণ করা যেমন তাকে যথাযথভাবে খাবার খাওয়ানো, পোশাক পরানো, তাকে অত্যাচার না করা, অপমান না করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন-

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

অর্থ: "তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাবার দান করে।" **[সূরা আদ-দাহ্‌র ৭৬:০৮]**

যদি সে দাস হয়ে থাকতে চায় তাকে দাস হিসাবে ধরা হবে (অর্থাৎ সে মালিকানাধীন দাস হবে)। তাকে হত্যা না করে তার থেকে ফিদিয়াও গ্রহণ করা যাবে। উপর্যুক্ত সুরতে যদি সে বাঁচতে নাও পারে বরং তাকে হত্যার ফায়সালা করা হয়, তাহলে হত্যার ক্ষেত্রেও তার সাথে সদয় আচরণ করা হবে— যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বন্দী নারী ও তাদের সন্তান-সন্ততির সাথে আচরণ, যেমন তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া, সম্মান করা এবং বন্দীদের গনীমত হিসেবে বণ্টনের আগ পর্যন্ত নারীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। বন্দী যদি দাসী হিসেবে মুসলিমের ঘরে আসে, সে যদি গর্ভবতী হয় অথবা ঋতুবতী তাহলে গর্ভ খালাস ও পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। বন্দীদের পরস্পর আত্মীয়দেরকে আলাদা করাও হারাম। যেমন মাকে সন্তান থেকে আলাদা করা এবং এধরনের নিকট আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও একই বিধান।

০৭. বিশ্বাসঘাতকতা হারাম, ইসলাম ধর্মে এটি একটি মহান নীতি এবং একটি মহৎ গুণ, এটি ইসলামের অন্য নীতিগুলোর মধ্যে অনেক মর্যাদাপূর্ণ। এতে রয়েছে নৈতিকতা ও আত্মমর্যাদাবোধ।

০৮. কাফেরদের সাথে সন্ধি ও যুদ্ধ বিরতির আলোচনা

তাদের সাথে যুদ্ধ বিরতি ও শান্তির জন্য সন্ধি চুক্তি করা ইসলামে অনুমোদিত কারণ, এতে রয়েছে তাদের জন্য অনুগ্রহ এবং আমাদের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে উপকারিতা, যা যুদ্ধবিদ ও সাধারণ সকলেরই জানা।

০৯. কাফেরদের নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনা

প্রয়োজনে মুসলমানদের অধিকৃত অংশে হারবি কাফেরকে নিরাপত্তা দেওয়া ইসলামের বিধান। যাতে সে নিজের জান মালের নিরাপত্তা পাবে। এই উদাহরণের সাথে হানাফিদের একটা অভিমত যুক্ত করছি তা হলো; যদি কোনো হারবি ব্যক্তি আমান নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তখন দেখা হবে, তার সম্পদ যদি নেসাব পরিমাণ হয়ে থাকে, তাহলে এক-দশমাংশ তার থেকে নেয়া হবে। আর এটা তখনই করা হবে যখন আমাদের অজানা থাকবে যে, তারা আমাদের কতটুকু সম্পদ নিয়েছে। তবে যদি জানা যায় তারা মুসলিমদের থেকে পুরো সম্পদ নিয়েছে, তাহলে আমরা পুরো সম্পদ নেবো না, বরং আমান রক্ষার্থে তাদেরকে নিরাপত্তা দিবো।

১০. জিম্মিদের সাথে আচরণ

এটি হচ্ছে যেকোনো কাফেরকে স্থায়ীভাবে নিরাপত্তা দেয়া, তবে শর্ত হচ্ছে, সে মুসলমানদের অধীনে থাকবে এবং মুসলমানদের শাসনের অধীনে থাকবে, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে থাকবে, আর মুসলিমরা তাকে রক্ষা করবে।

এখন কথা হচ্ছে উপর্যুক্ত বিধান ও শর্ত পালনের ক্ষেত্রে যদিও সম্মানের অভাবে, অপদস্থতার কারণে জিম্মিদের উপর কোনো ধরনের কঠোরতা প্রতীয়মান হয়, এরপরও একথা বলার অনুমতি নেই যে, এটা ইনসাফের পরিপন্থী, বরং বলতে হবে, এটাই ন্যায়বিচারের সারমর্ম। চিন্তাশীলরা একটু চিন্তা করলেই বলতে পারবে যে, এটা তার উপর শুধু ইনসাফই নয়, বরং অধিক দয়া ও ইহসান। কেননা কাফের তার অপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ড এবং তার চেয়ে কঠোরতম শাস্তির যোগ্য।

আসল কথা হচ্ছে কাফেরদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজ্ঞার অভাব, তাই তো তারা নিজেরা, তাদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিরা এবং তাদের সংস্কৃতি দ্বারা কলুষিত অজ্ঞরা ইসলামের এই ন্যায়পরায়ণতাকে অস্বীকার করে। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে এ অপবাদ দেয় যে, ইসলামের এই বিধানগুলো ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

তাদের জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ

অর্থ: "তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই।" [সূরা আন-নাজ্‌ম ৫৩:৩০]

তাদের জ্ঞানের উদাহরণ হলো, (নির্বোধের জানা না জানা দুটোই সমান) তারা নিজেদের ধারণা থেকে বলে থাকে, মানুষের মাঝে ইনসাফ বলতে শুধু সমঅধিকার রক্ষা করা। তাই তো তারা মানুষের মাঝে ইনসাফ বলতে তথাকথিত সমঅধিকারকেই বুঝায়। অথচ বিষয়টি একেবারে এমন নয়, বরং এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা ও ভুল। বাস্তবতা হলো, সমান অধিকার তো ঐ জিনিসগুলোর মাঝে ইনসাফ হিসেবে গণ্য হবে যেগুলোর মাঝে পরস্পর উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। আর পৃথক পৃথক বিষয়গুলোর অধিকারের মাঝেও পার্থক্য থাকবে, এটি সর্বজন স্বীকৃত। এবার আসুন মুসলমান ও কাফেরের মাঝে এমন কি মিল রয়েছে যার কারণে এদের মাঝে পার্থক্য করা যাবে না? বরং এদুয়ের মাঝে পার্থক্য আকাশ পাতাল। আল্লাহ তাআলাই তো পার্থক্য করে বলেছেন-

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما لكم كيف تحكمون

অর্থ: "আচ্ছা, আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব? তোমাদের কী হলো? তোমরা কী রকমের সিদ্ধান্ত করছ?" [সূরা আল-কালাম ৬৮: ৩৫-৩৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

অর্থ: "যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি কি তাদেরকে সেই সব লোকের সমান গণ্য করব, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে? নাকি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমান গণ্য করব?" [সূরা সোয়াদ ৩৮: ২৮]

তিনি আরও বলেন-

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ

অর্থ: "আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে ফাসেক? (বলা বাহুল্য) তারা সমান হতে পারে না।" [সূরা আস-সাজদাহ্ ৩২: ১৮]

সুতরাং উপর্যুক্ত বিষয় থেকে ইসলামের সহনশীলতা, অনুগ্রহ ও সদাচারণতা প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও অনুগ্রহের আরও অনেক দিক রয়েছে যেমন, জিযিয়ার পরিমাণ, তা হচ্ছে অতি সামান্য একটি দিনার বা তার সমপরিমাণ জিনিস। কখনো কখনো অবস্থার প্রেক্ষিতে এর পরিমাণ বেড়ে যায় আবার কমেও যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক ও সক্ষম ব্যক্তির উপর তার সক্ষমতা অনুযায়ী ওয়াজিব হবে। জিযিয়ার পরিমাণ এত কম হওয়া সত্ত্বেও তা শিশু, মহিলা ও অক্ষম ব্যক্তিদের কাছ থেকে নেয়া হবে না।

নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করলে পরাজিত ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামী আচরণ নীতির তুলনায় অধিক ইনসাফপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর আচরণ নীতি পাওয়া সম্ভব নয়। ইতিহাস সাক্ষী, রাষ্ট্র যখন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়- তা যেমনই হোক না কেন- তখন এটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী শরীয়তই সর্বশ্রেষ্ঠ, সুমহান। এর কোনো তুলনা নেই। অপরদিকে রাষ্ট্র যদি কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাই হয়ে পড়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। অনিষ্ট ও অকল্যাণের যত প্রকার হতে পারে সবই তাতে পাওয়া যায়। বর্তমানে নাস্তিক্যবাদী পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রবঞ্চনাপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং 'গণতন্ত্র' নামক ধর্মের তথাকথিত স্বাধীনতা ও সাম্যবাদ নিয়ে গলাবাজি করলেও এই স্বাধীনতা ও সাম্যবাদকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দিনের পর দিন এক আল্লাহর ইবাদতকারী, সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকারী তাওহীদবাদী

মুসলিমদের গণহত্যা ও নির্যাতন করে যাচ্ছে। এসব কখনও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণ কর্তৃক কিংবা সমন্বিতভাবে চালানো হচ্ছে, কখনও আইন প্রণয়ন করে, কখনও আইনের অপব্যবহার করে, কখনও ভীতি প্রদর্শন, কখনও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, কখনও জোরপূর্বক মুসলিমদের কোণঠাসা করে রেখে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে, কখনও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন চালিয়ে সীমালঙ্ঘন করে, কখনও বিভিন্নভাবে কষ্ট দান ও ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী মিশন চালানো হচ্ছে। এ গণহত্যা তারা মুসলিম হওয়া অথবা তাদের অধীনে থাকা মুসলিমরা মুরতাদ হওয়া (নাউযুবিল্লাহ) কিংবা মুসলিমরা ফিসক-পাপিষ্ঠতা বা আপোষকামিতার পথ বেছে নেওয়ার পূর্বে কিছুতেই থামবে না। আর এটাতো স্পষ্ট যে, এই কাফেররা মুসলিম হবে না। আল্লাহ তাআলার কাছে আফিয়াত ও সালামাত কামনা করছি।

কাফেররা বিজয়ী হলে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে মুসলিমদের উপর তাদের জুলুম নির্যাতন মারাত্মক আকার ধারণ করবে, যদিও তারা দাবি করে ভিন্ন কিছু। তারা তো আইন-কানুন ও ঘোষিত মূলনীতিগুলোকে সামান্য মূল্যও দেয় না। শুধু শ্লোগান আর প্রতীক ব্যবহার করে কোনো কাজ হয় না কারণ আইন-কানুনকে তারা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজেদের খেয়াল খুশি মতো পরিবর্তন করে নেয়। তাদের সিদ্ধান্ত কতইনা নিকৃষ্ট, যাদের না আছে তাকওয়া, না আল্লাহর ভয়, না আছে কিয়ামতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস।

কিন্তু মুসলিমরা বিজয়ী হলে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে এমন হবে না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকা কাফেরদের সাথে আচরণ নীতি কেমন হবে ইসলাম তাদেরকে তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে: “তোমাদের সাথে এই এই আচরণ করা হবে, রাষ্ট্রের কাছে তোমরা এই এই অধিকার পাবে,” শরীয়ত এক্ষেত্রে কোনো ধোঁকা কিংবা মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়নি, কোনো অতিরঞ্জন কিংবা দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নেয়নি। স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, “তোমাদের সাথে এই এই আচরণ করা হবে, আর তোমরা এরই উপযুক্ত। তোমরা এর থেকে উত্তম কিছু পাবে না।”

আর মুসলিমরা মুত্তাকী, আল্লাহ তাআলাকে ভয়কারী, তারা সত্যনিষ্ঠ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহ তাআলার অনুগত। আলহামদুলিল্লাহ।

এগুলো থেকে আলেমদের ও সাহিত্যিকদের আলোচনায় থাকা ইসলামের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়।

১১. জিম্মি, চুক্তিবদ্ধ ও নিরাপত্তা প্রার্থী কাফেদের সাথে ইসলামী শরীয়ত উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের জন্য স্বতন্ত্র বিধি-নিষেধ তৈরি করেছে, তাদের হকগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে। এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার চুক্তি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিরাপত্তার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না, যদিও চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়।" (বুখারী)

ইসলামী শরীয়ত জিম্মিদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনু খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, " পরবর্তী খলীফাকে আমি অসিয়ত করছি তিনি যেন অগ্রবর্তী মুহাজিরদের সাথে উত্তম আচরণ করেন, তাঁদের হক আদায় করেন। তাঁকে আনসারদের ব্যাপারে অসিয়ত করছি যাঁরা ঈমানের জন্য নিজেদের ভূমিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন; তিনি যেন তাঁদের ভালো কাজগুলো কবুল করেন, মন্দগুলো ক্ষমা করেন। তাঁকে আরও অসিয়ত করছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় থাকা কাফেরদের ব্যাপারে; তিনি যেন তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেন, তাদেরকে রক্ষা করেন, তাদের উপর যেন এমন কিছু চাপিয়ে না দেন যা তাদের সাধ্যের বাহিরে।" (বুখারী)

জিম্মি কাফেররা আল্লাহ তাআলার এই ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

অর্থ: "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন"। [সূরা মুমতাহিনা ৬০:০৮]

১২. কাফেরদের নিরাপত্তা দানের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য তাদের হেদায়াতের পথ সুগম করা। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকার সুবাদে জিম্মি কাফেররা ইসলামকে জানার সুযোগ লাভ করে, ইসলামের সৌন্দর্য, শিষ্টাচার ও সুউচ্চ আদর্শ কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করে। ইসলামী ফিকহ ও বিধি-বিধানের পূর্ণাঙ্গতা বুঝতে পারে, যা সাক্ষ্য দেয় যে, এ দীন আল্লাহ তাআলার নিকট থেকেই এসেছে। এছাড়াও এ শাশ্বত দীনের মহানুভবতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভবতা, সৎকর্মশীলতা, পবিত্রতা, মহত্ত্ব, স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সৌন্দর্য নিজ চোখে দেখতে পায় যা তাদের এবং মানব সমাজের মাঝে উত্তম সুন্দর ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, দীনের পুরোটাই কল্যাণকর ও বরকতময়। ফলে তারা বুঝতে পারে (যদি বাস্তবেই বুঝতে চায়) : এ সত্য ও সুস্পষ্ট দীন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আগত। তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর আল্লাহ তাআলা একথাই বলেছেন:

كنتم خير أمة أخرجت للناس

অর্থঃ “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত মানবজাতির জন্য তোমাদের উত্থিত করা হয়েছে।” [সূরা আলে ইমরান ০৩:১১০]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: অর্থাৎ মানবকল্যাণে তোমরা লোকদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের তোমরা গলায় শেকল পরিয়ে নিয়ে আসবে যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা এক সম্প্রদায়কে দেখে অবাক হন, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে শিকলবদ্ধ অবস্থায়।” (উভয় হাদীস ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন)।

আলেমগণ বলেছেন, “এর অর্থ তাদেরকে বন্দী করার পরে ইসলাম গ্রহণ করে; ফলে জান্নাতে প্রবেশ করে।”

১৩. কাফের পিতা-মাতার সাথে আচরণ

কাফের আত্মীয় স্বজনের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ

অর্থঃ "আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভ ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে"। [সূরা লোকমান ৩১ :১৪]

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

অর্থঃ "আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ কর। তারপর তোমাদের ফিরে আসা আমারই কাছে, তখন তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবিহিত করব"। [সূরা লোকমান ৩১:১৫]

তিনি আরও বলেন:

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجۡعَلَ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَ ٱلَّذِينَ عَادَيۡتُم مِّنۡهُم مَّوَدَّةٗۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٞۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

অর্থঃ "যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমতাবান। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। [সূরা মুমতাহিনা ৬০: ০৭]

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

অর্থঃ "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন"। [সূরা মুমতাহিনা ৬০: ০৮]

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

অর্থঃ "আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করাতে সাহায্য করেছে। আর তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই তো জালিম"। [সূরা মুমতাহিনা ৬০: ০৯]

এসব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট। এসব আয়াতের অন্তর্নিহিত কল্যাণ, হক ও হেদায়াত সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে, চিন্তা-ভাবনা করতে চাইলে তাফসীর দেখা যেতে পারে। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই।

সূরা মুমতাহিনার এই আয়াত সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: সূরার শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন কাফেরদেরকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করেছেন, তাদের থেকে ভালোবাসার সম্পর্কে ছিন্ন করেছেন তখন কেউ কেউ ভেবেছিলেন, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাও বুঝি তাদের বন্ধু বানানো এবং তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখার অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। তখন আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এসব বন্ধু বানানো, হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখার অন্তর্ভুক্ত নয়, আর তিনি সদাচার করতে, সদ্ব্যবহার

করতে নিষেধ করেনি বরং কাফেরদের সাথে সদাচার করা তিনি ভালোবাসেন, পছন্দ করেন, আর একে তিনি সবার উপর স্থান দিয়েছেন।

আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "মুসলিমরা কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় একবার আমার মা আমার কাছে আসেন, তিনি ছিলেন মুশরিক এবং কুরাইশদের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জানতে চাইলাম: "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা আমার কাছে এসেছে। তিনি দীনকে পছন্দ করেন না, আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবো?" তিনি বললেন, "অবশ্যই তুমি সদ্ব্যবহার করবে।" (সহিহাইন)

এগুলো কাফেরদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের মহানুভবতার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তার বিস্তৃত রহমতের উসীলায় আমাদের প্রতি রহম করেন।

সপ্তম মজলিস

কোমলতা ও কঠোরতা সংশ্লিষ্ট আলোচনা:

এর কিছু আলোচনা ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, এখানে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

ومن حُرِمَ حَظَّهُ من الرِّفْقِ فقد حُرِمَ حَظَّهُ من الخير

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোমলতা থেকে বঞ্চিত হলো সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো।"

আহলে ইলমগণ বলেন, ব্যক্তি কল্যাণের অংশ পাবে তার কোমলতার পরিমাণ হিসেবে। যতটুকু কোমলতা থেকে সে বঞ্চিত হবে ততটুকু কল্যাণ থেকে সে বঞ্চিত হবে। তুহফাতুল আহওয়াযিত এমনটাই উল্লেখ রয়েছে। পূর্বের হাদীস খানার চেয়ে অধিক স্পষ্ট আরও একটি হাদীস হচ্ছে:

من أُعْطِيَ حَظَّهُ من الرِّفْقِ فقد أُعْطِيَ حَظَّهُ من الخيرِومن حُرِمَ حَظَّهُ من الرِّفْقِ فقد حُرِمَ حَظَّهُ من الخيرِ

অর্থঃ "যাকে তার কোমলতার অংশ দেওয়া হয়েছে তাকে তার কল্যাণের অংশ দেওয়া হয়েছে আর যাকে তার কোমলতার অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে তার কল্যাণের অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য : "আল্লাহ কোমল।" এটা কি আল-আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহর উত্তম নামসমূহের অংশ নাকি গুণসমূহের অংশ! যেকোনোটাই হতে পারে। এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের দুই মাযহাব। কেউ নাম ধরেছেন, কেউ সিফাত। আমার কাছে বেশি স্পষ্ট হচ্ছে- আল্লাহ ভালো জানেন- এটি সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টি আকীদার কিতাবের আলোচনা। এটা নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়েরে মতো-

إِنَّ اللّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ

إِنَّ اللّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

অর্থঃ "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।" [মুসলিম ৯১]

অর্থঃ "আল্লাহ উত্তম; উত্তম বিষয় তিনি পছন্দ করেন।" [মুসলিম ১০১৫]

হাদীস দুটি শরহুন নববীতেও দুই জায়গায় এসেছে। ইমাম তাবারনী ও আব্দুর রাজ্জাক তাঁদের মুসান্নাফে উল্লেখ করেন-

إنَّ اللّٰهَ محسنٌ يُحبُّ الإحسانَ

"আল্লাহ সদাচরণকারী; তিনি সদাচার পছন্দ করেন।" অন্য হাদীসে এসেছে:

إنَّ اللَّهَ طيِّبٌ يحبُّ الطَّيِّبَ نظيفٌ يحبُّ النَّظافة كريمٌ يحبُّ الكرمَ جوادٌ يحبُّ الجودَ فنظِّفوا أُراهُ قالَ أفنيتَكُم ولا تشبَّهوا باليَهود

অর্থঃ "আল্লাহ উত্তম, উত্তমতা পছন্দ করেন; পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন; মহান, মাহাত্ম্য পছন্দ করেন; পরম দানশীল, দানশীলতা পছন্দ করেন। তোমরা পরিচ্ছন্ন রাখো" —বর্ণনাকারী বলেন: আমার মনে হচ্ছে তিনি বলেছেন:— তোমাদের আঙিনা। তোমরা ইহুদীদের মতো হয়ো না।"

তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ এ হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ এ হাদীসটি তাঁর কিতাবে বর্ণনা করার পর বলেন, এটা গরীব হাদীস, আর খালেদ বিন ইলিয়াসকে (এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) জয়ীফ মনে করা হয়। তাকে বিন ইয়াস বলা হয়।

কোমলতা কঠোরতা নম্রতা রুক্ষতা নিয়ে আলোচনাকে আরও দীর্ঘ করতে চাচ্ছি। কারণ, এ বিষয়গুলো বোঝা জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত। মুজাহিদগণেরও এ বিষয়গুলোর জ্ঞান লাভ করা এবং তা আত্মস্থ করা অনেক জরুরি। আশা করি এ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের তরুণদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অবদান রাখতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছে কবুলিয়্যাত ও বরকত চাই।

এখানে কোমলতার কিছু আমলী (চর্চা গত) দিক উল্লেখ করছি, যাতে মানুষ কোমলতার অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ করতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা আবু আউন আনসারির কথাটি উল্লেখ করছি :

“মানুষ যে কোনো কঠিন কথা বলে তার স্থানে অবশ্যই এমন কোনো নম্র কথা থাকে যা তার এই কঠিন কথা বুঝানোর জন্য যথেষ্ট হবে।”

অর্থাৎ মানুষ কথা বলার আগে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তার কথা ও কাজের বিষয়ে ভাববে, চিন্তা করবে তা অর্জনের মাধ্যম নিয়ে। এ আলোচনা আমাদেরকে উত্তম কথা শেখা ও একই কথাকে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করার গুরুত্ব বুঝিয়েছে। আমাদের বুঝিয়েছে উত্তম চরিত্রবানদের অনুসরণের গুরুত্ব। যাতে আমরা উত্তম রূপে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি।

চারিত্রিক নীতি হলো, কোমলতা ও কঠোরতার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা :

কোমলতা, কঠোরতা, নম্রতা, রুক্ষতা এসবের মাঝে সমতা রক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য শিষ্টাচারের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি। চাই তা ব্যক্তিগত বা সামাজিক। যে নিছক নম্রতা ভদ্রতা দিয়ে শিক্ষার দেয়ার পক্ষে আর কঠোরতার সময় সামান্য কঠোর হতেও নারাজ, তদ্রূপ যে নম্রতা ভদ্রতা দিয়ে ইসলাহ করতে চায় অথচ কঠোরতার সময় কঠোর হতে চায় না, সে মূলনীতির কিছু অনুসরণ করছে, কিছু ছাড়ছে। তাকে জাহেল বলতে দ্বিধা নেই।

শরীয়ত শর্ত সহকারে চোরের হাত কাটার আদেশ করে। কিসাস হিসেবে হত্যাকারীকে হত্যা করে। বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে। অবিবাহিত ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাত করে। এমন সব হদ্দের কারণে যিন্দিকরা উপহাস করে শরীয়তকে কঠোর বলে বেড়ায়। আমরা তাদের নিয়ে আলোচনা করতে যাব না। কারণ তারা স্রোতে হারিয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

“আপনি বলুন, হক এসেছে বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। আর বাতিল তো বিলুপ্ত হবেই।”[সূরা বনি ইসরাঈল ১৭:৮১]

দার্শনিকগণ বলে থাকেন :

কঠোরতা অবলম্বন করা হয় (অন্যায় থেকে) বাঁচিয়ে রাখতে, আর বিচক্ষণও কখনো কখনো এমন ব্যক্তির উপর কঠোর হয় যাকে অন্য সময় দয়া করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে তার দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, অচিরেই আল্লাহ এমন একটি সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, যারা মুমিনদের প্রতি হবে সদয় আর কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর।" [সূরা মায়েদা ০৫:৫৪]

এ আয়াতের আলোকে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের এ সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাদের কেউ যদি দীন থেকে ফিরে যায় তাহলে আল্লাহ ওই মুরতাদের পরিবর্তে এমন গুণের একটি সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন অর্থাৎ মুমিনদের প্রতি সদয় কোমল সদাচারী আর কাফেরদের প্রতি কঠোর রুক্ষ। এটাই একজন মুমিনের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ কারণে আল্লাহ তাঁর নবীকে মুমিনগণের প্রতি সদয় হওয়ার আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ "আপনি মুমিনদের জন্য নম্রতার ডানা বিছিয়ে দিন।" [সূরা হিজর ১৫:৮৮]

তিনি আরও বলেন:

واخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ "মুমিনদের মাঝে যারা আপনার অনুসরণ করে তাদের প্রতি সদয় হন।" [সূরা শুআরা ২৬:২২৫]

পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে (মুমিন ছাড়া) অন্যদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অর্থঃ “হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হন, তাদের আশ্রয় স্থল জাহান্নাম আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান!” [সূরা তাওবা ০৯:৭৩]

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সদয় হওয়ায় তাঁর নবীর প্রশংসা করেছেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

অর্থঃ “আল্লাহর পক্ষ হতে রহমতের কারণে আপনি তাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। যদি আপনি রুক্ষ কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে যেত।” [সূরা আলে ইমরান ০৩:১৫৯]

সামনের আয়াত দ্বারা তো আল্লাহ তাআলা আরও স্পষ্ট করে দেন যে মুমিনদের প্রতি সদয় হওয়া আর কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সিফাত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থঃ “মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তাঁর সাথে যারা যারা আছে তাঁরা কাফেরদের প্রতি কঠোর আর পরস্পরে দয়ালু।” [সূরা ফাতহ ৪৮:২৯]

এ সকল আয়াত থেকে বুঝে আসে যে, একজন মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে নম্র হওয়ার সময় নম্র হওয়া এবং কঠোরতার সময় কঠোর হওয়া। কারণ কঠোরতার সময় নম্রতা হলো দুর্বলতা আর নম্রতার সময় কঠোর হওয়া বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা।

আবু তায়্যিব মুতানাব্বী বলেন:

إذا قيل حلم قل فللحلم موضع

وحلم الفتى في غير موضعه جهل

যখন নম্র হতে বলে বলো নম্রতারও যথাস্থান আছে।

কারণ অপাত্রে নম্র হওয়া নির্বুদ্ধিতা।

কুরআনের অধিকাংশ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করার আদেশ করা হয়েছে, তার কারণ হলো: দীন ইসলাম মিল্লাতে ইবরাহীমের মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সেটা হলো, কঠোরতা ও নম্রতার মাঝে সমতা রক্ষা করা। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

অর্থঃ "তিনি তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে কোনো কঠোরতা রাখেননি, তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত (অনুসরণ করো)।" [সূরা হজ, ২২:৭৮]

সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ বলেন: "তারবিয়াতের ক্ষেত্রে যারা এই মূলনীতির উপর চিন্তা করতে আগ্রহী, কুরআনে কারীমের সূরা নূর তাদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র। সূরা নূরের মৌলিক বিষয়ই হলো তারবিয়াত প্রদান করা। সেখানে যেমন তারবিয়াতের সর্বোচ্চ মাধ্যম হুদুদের আলোচনা করা হয়েছে তেমনিভাবে অনুভূতি জাগরণ ও নম্র তারবিয়াতেরও উত্তম নিদর্শন পেশ করা হয়েছে। যেটি অন্তরকে আল্লাহ তাআলার নূরের দিকে নিয়ে যায়। তাকে রাহনুমায়ী করে পৃথিবী ও মানব-জীবনের জন্য আল্লাহ তাআলার সুনিপুণ নির্ধারিত বিধানাবলীর দিকে। বস্তুত, কঠোর ও নরম বিধান প্রণয়নের লক্ষ্য একটিই; সেটি হলো অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা, অনুভূতিকে দীপ্ত করে তোলা, জীবনের চারিত্রিক উন্নতি সাধন করা, যাতে মানব জীবন সুস্থ ও সবল হয়ে উঠে, আল্লাহর নূরে নুরান্বিত হয়। মূলত ব্যক্তিগত, মনস্তাত্ত্বিক, গৃহ ও পারিবারিক এবং জামাআত ও নেতৃত্বের শিষ্টাচার— সবকিছু একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; কারণ, এগুলোর সবই একটি উৎস থেকে উদ্ভূত, সেটি হলো এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। একই নূরে নূরান্বিত, সেটি হলো আল্লাহর নূর। এগুলো হলো আলো, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও পবিত্র। যার মূল তারবিয়াত আসে আসমান-জমিনের প্রথম নূরের উৎস থেকে। তা হলো আল্লাহর নূর। এমন নূর যেটি দূর করে দেয় আসমান-জমিন, কলব-হৃদয় এবং নফস ও রূহের মাঝে জমে থাকা সকল অন্ধকার।" [তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন]

কঠোরতা ও জিহাদ:

জিহাদ মানেই কঠোরতা জিহাদকে কঠোরতা বলা কি সঠিক? জিহাদ আল্লাহর একটা শরয়ী বিধান। যা দীন ইসলাম নিয়ে এসেছে। যেমন তা মুসা আলাইহিস সালামসহ তাঁর পরবর্তী অনেক নবীর শরীয়তেও ছিল। যেমন : ইউশা, দাউদ, সুলাইমান আলাইহিমুস সালাম প্রমুখ।

উলামায়ে কেরাম বলেন: জিহাদের সূচনা ফেরাউনের ধ্বংসের পর মুসা আলাইহিস সালামের শরীয়ত থেকেই। তাঁরা সূরা কাসাস ও সূরা মুমিনুনের এ আয়াতদ্বয় থেকে ইস্তিম্বাত করেন;

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

অর্থঃ “আমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করার পর মুসাকে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব, যা ছিল মানুষের জন্য জ্ঞান-তথ্যসমৃদ্ধ এবং হেদায়াত ও রহমত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।” [সূরা কাসাস ২৮:৪৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

অর্থঃ “আর আমি মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যাতে তারা হেদায়াত লাভ করে।” [সূরা মুমিনুন ২৩:৪৯]

উভয় আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করার পর মুসা আলাইহিস সালামের জাতিকে শরীয়ত প্রদান করার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহি বলেন: তাওরাত নাযিলের পর কোনো জাতিকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হয়নি। বরং মুমিনদের আদেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের।

শায়খ সাদী বলেন: দীর্ঘদিন ধরেই কতক আলেমের কথা শুনে আসছি। তাদের নাম মনে আসছে না এখন। তাওরাত নাযিল ও মুসা আলাইহিস সালামের পর আল্লাহ তাআলা উম্মত থেকে ব্যাপক শাস্তি উঠিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ কোনো জাতিকে সমূলে ধ্বংস করা। আর পরবর্তী নবীদের যুগে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান দেয়া হয়েছে। জানি না তারা সেটা কোথায় পেয়েছে। কিন্তু আমি যখন দুই সূরার আয়াতগুলো নিয়ে তাদাব্বুর করেছি, তখন আমার কাছে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে (সূরা মুমিনুনের আয়াত) আল্লাহ লাগাতার ধ্বংস হওয়া জাতির কথা উল্লেখ করলেন। এরপর বললেন: "তারপর তিনি মুসাকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন।" এরপর তিনি ফেরাউনের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেননি। কেননা সেটা তাওরাত নাযিলের আগেই হয়েছে। আর সূরা কাসাসে তো আরও স্পষ্ট। সেখানে ফেরাউন ধ্বংসের কথা বলার পর আল্লাহ তাআলা বললেন:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

অর্থঃ "আমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করার পর মুসাকে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব, যা ছিল মানুষের জন্য জ্ঞান-তথ্যসমৃদ্ধ এবং হেদায়াত ও রহমত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" [সূরা কাসাস ২৮:৪৩]

এখানেই স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস করার পরই তাঁকে কিতাব দিয়েছেন। এরপর তিনি বলেছেন তা নাযিল করেছেন মানুষের জন্য জ্ঞান তথ্য সমৃদ্ধ এবং হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। সম্ভবত এখান থেকেই তারা উক্ত মতামত ইস্তিম্বাত করেছেন। অথচ সূরা ইউনুসে ইউনুস আলাইহিস সালামের জাতির আলোচনা করে আল্লাহ তাআলা এমনটি বলেননি।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ.

অর্থ: “তারপরে (নূহের পরে) আমি বিভিন্ন নবীকে তাঁদের স্ব-স্ব জাতির কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা প্রথমবার যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তা আর মানতেই প্রস্তুত হলো না। যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের অন্তরে আমি এভাবে মোহর করে দেই। তাদের পর আমি মুসা ও হারুনকে প্রেরণ করেছি।” [সূরা ইউনুস ১০:৭৪-৭৫]

আল্লাহু আলাম।

আল্লাহ তাআলা সূরা কাসাসে বলেন : আমি মুসাকে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব (তাওরাত) পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করার পর।

যারা সর্বশেষ সমূলে শাস্তির অধিকারী হয়েছিল তারা ফেরাউন ও তার সৈন্যদল। এটাই দলীল তাওরাত নাযিলের পর ব্যাপক শাস্তি বন্ধ হয়ে গেছে এবং তরবারি নিয়ে জিহাদের বিধান এসেছে।

ইমাম বাকাঈ রহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাব ‘নাযমুদ দুরারে’ বলেন: যেহেতু তাওরাতের হুকুম আসন্ন সময়কে অন্তর্ভুক্ত করছে না তাই এখানে জোর দানকারী হরফের মাধ্যমে সময়ের আলোচনা করা হয়েছে। এই আয়াতে من بعد ما বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ বিধান শুধু নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য, পরে আল্লাহ তাআলা যখন চান তা মানসুখ করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

اهلكنا القرون الاولى

আমি পূর্ববর্তী জাতিকে ধ্বংস করেছি- তথা আমার ক্ষমতাবলে। পূর্ববর্তী জাতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নূহ আলাইহিস সালামের জাতি থেকে ফিরআউনের কওম পর্যন্ত সবাই। এ আয়াতে ধ্বংসের সময় বলে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, তাওরাত নাযিলের পর কোনো জাতিকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হবে না—

তাওরাতের প্রতি এবং যার উপর তা নাযিল হয়েছে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

এ ইখতিলাফ অতি সূক্ষ্ম একটি বিষয়।

তবে এক্ষেত্রে আগ্রহীর জন্য দুটি বিষয় সহায়ক হতে পারে।

প্রথমত- কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে সাব্যস্ত যে, জিহাদ মুসা আলাইহিস সালামের পরে বনি ইসরাঈলের কতক নবীর শরীয়তেও বৈধ ছিল। যেমন কুরআনে জালুত-তালুতের ঘটনা আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন;

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থঃ "মুসার পর বনি ইসরাঈলের এক দল তাদের নবীকে বলল: "আপনি আমাদেরকে একজন আমীর দিন আমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবো।" [সূরা বাকারা, ০২:২৪৬]

আর হাদীসেও ইউশা, দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমুস সালামের জিহাদের ঘটনা আছে। দ্বিতীয়ত যুক্তির আলোকেও বোঝা যায় যে, জিহাদ তো সমূলে ধ্বংসের পরিবর্তে আল্লাহর ঐ সকল শত্রুর বিরুদ্ধে, যারা রাসূলদেরকে দাওয়াতে বাধা দিত। ফলে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী জাতিদেরকে সমূলে ধ্বংস করতেন। কিন্তু যেহেতু জিহাদের বিধান দেয়া হয়েছে তাই সমূলে ধ্বংস করার বিধান নেই। সূরা কাসাসের আয়াতসমূহ থেকেও এমনটি প্রতীয়মান হয়। উলামায়ে কেরামগণও এমনই বুঝেছেন। আল্লাহু আলাম।

আর ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ যে মুসা আলাইহিস সালামের পরে কোনো জাতিকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হয়নি।

যেমন ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ সূরা ইয়াসীনের তাফসীরে বলেন: আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অনেক সালাফ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাওরাত নাযিলের পর কোনো জাতিকে ব্যাপক আযাব দিয়ে ধ্বংস করেননি।

মাহাসিনুত তাবীলের মধ্যে ইমাম কাসেমী রহিমাহুল্লাহ এতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন: "ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ ব্যাপক আযাব স্থগিত হওয়ার যে বিষয়টি বলেছেন, তার জন্য অকাট্য প্রমাণ দরকার, কারণ এরপরেও বহু অপরাধী শহরকে ধ্বংস করা হয়েছে।"

গ্রন্থকার বলেন: ইমাম কাসেমী রহিমাহুল্লাহর কথায়ও আপত্তি রয়েছে, কারণ ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ যে মতটি উল্লেখ করেছেন তার জন্য অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেননা এটা প্রবল ধারণার বিষয়। তিনি যে বিভিন্ন শহরকে ধ্বসে দেয়ার দাবি করেছেন, সেটাও তো খোদ প্রবল কোনো ধারণার অন্তর্ভুক্ত না।

এ যুগের কতক মুনাফিক কাফেরদের দোসররা জিহাদকে বলে কঠোরতা। মুজাহিদদেরকে বলে কঠোর, যেমনটা লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে। এটা তাদের হকের বিষয়ে অজ্ঞতা, হঠকারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা। কারণ জিহাদ হলো আল্লাহর বিধান যা তিনি বৈধ করেছেন এবং যার মর্যাদা তিনি বৃদ্ধি করেছেন। আর আল্লাহ তা পছন্দ করেন, তার আদেশ করেন এবং যারা তা করে তাদের প্রতি খুশি হন, তাদের মর্যাদা উচ্চতায় উন্নীত করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক, দয়াময়, কোমল, মহান, স্নেহময় এবং দয়াময়দের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম দয়াশীল। তদ্রূপ তিনি পরাক্রমশালী, প্রতাপশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তাঁর রয়েছে উত্তম নামসমূহ ও উচ্চ গুণসমূহ। আমরা তাঁর প্রশংসা গণনা করতে পারি না যেমন তিনি আপন সত্তার প্রশংসা করেন।

পরকথা জিহাদ হলো শুধু রহমত। বান্দার জন্য কল্যাণের বিষয়। পৃথিবীতে সংশোধনের একমাত্র মাধ্যম। এটা কোনো বিশৃঙ্খলা না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে জিহাদের বিধান নিয়ে কোনো সন্দেহ করবে সে নিশ্চয়ই কাফের, তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কারণ, যে আল্লাহর দীন অস্বীকারকারী সে দীনের ব্যাপারে আলোচনার বাহিরে। আর যে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততা রেখে এ বিষয়ে সন্দেহ করবে সে তো মুনাফিক। তার উচিত দ্রুত তাওবা করা, ঈমান শুদ্ধ করা। উপকারী ইলম, হেদায়াত ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে নূর দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা দিয়ে তার অসুস্থ অন্তরের চিকিৎসা করা। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। একনিষ্ঠভাবে হকের সন্ধান করা তার কর্তব্য। যদি সে তা করে,

ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তার হৃদয়কে সত্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন এবং তাকে হেদায়াত দেবেন।

জিহাদ আল্লাহর একটা ফরয বিধান। আর আল্লাহর সকল বিধানই সত্য, ন্যায়, উপকারী ও কল্যাণকর।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقًا وَعَدۡلًاۚ

অর্থঃ "আর আল্লাহর কালিমা সত্যতা ও ন্যায়ের দিক থেকে পূর্ণ হয়ে গেছে।" [সূরা আনআম ০৬:১১৫]

হ্যাঁ জিহাদ কঠিন ও কঠোর ওসব কাফেরের জন্য, যাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হয়। তখন সে কঠোরতা প্রশংসনীয়, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট বিষয়।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম যথাসময়ে ও যথাস্থানে কঠোরতা ও নম্রতা প্রদর্শনের বিষয়ে। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজন ইনসাফ এবং হিকমতের। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

পাঠক বলতে পারেন, এটা এমন কঠোরতা যা আল্লাহ বৈধ করেছেন, পছন্দ করেন এবং যার আদেশ করেন তিনি। কঠোরতা কাঠিন্য সবসময় নিন্দনীয় নয়। বরং যেখানে সুন্দর আচরণ করা যায় সেখানে কঠোরতা দেখানো নিন্দনীয়।

পূর্বের কথায় আমরা এদিকে ইঙ্গিত করেছি যে, 'কঠোরতা' আভিধানিক ও শরয়ী পরিভাষায় নির্দিষ্ট কিছু সময় নিন্দনীয়। আর তা হলো অপাত্রে ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোরতা দেখানো। এজন্য জিহাদকে ব্যাপকভাবে কঠোরতা বলা যাবে না। যেমন একটু আগে আমরা এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। পক্ষান্তরে যারা জিহাদের শত্রু, তারা এ উম্মাহর ভ্রষ্ট দল, তথাকথিত নামধারী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ আলেম। যারা জিহাদকে কঠোরতা বলবে, বাস্তবে এরা জাহেল। কখনো কখনো এরা সীমালঙ্ঘনকারী। তারা ঈমানের বিরাট ঝুঁকিতে আছে।

মোটকথা, যারা জিহাদকে কঠোরতা বলে সম্বোধন করবে, তারা দীন থেকে কত না দূরে! তবে মুসলিমদের মধ্যে যারা এমনটা বলে থাকে তাদের ব্যাপারে হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ তাদের কেউ কেউ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দৃষ্টিতে এমনটা প্রকাশ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সে বাধ্য হয়ে করে। কেউ কেউ এমন সূক্ষ্মভাবে তা ব্যক্ত করে মনে হয় সেও বাধ্য। অনেকে তো পুলিশি অভিযান থেকে বাঁচার ভয়েও এমনটি বলে থাকে। সে হিসেবে সেও তো বাধ্য। তাই আমরা কারো প্রতি জুলুম করতে চাই না। সংক্ষিপ্তভাবে আমরা সবার ওজর শুনবো। কারো কারোটা বিস্তারিত ভাবে জানবো। তাদের অবস্থা বুঝবো। তখন আমরা তাদের চিন্তা-চেতনা বুঝতে পারবো। সবাই নিজের কাছে দায়বদ্ধ। সকলে আপন কৃতকর্মের বিষয়ে জিম্মাদার। সকলে নিজের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। মানুষকে ধোঁকা দিতে চাইলে তা পারবে কিন্তু আল্লাহকে তো আর ধোঁকা দিতে পারবে না! সুতরাং জিহাদ জরুরি প্রয়োজনে বৈধ করা হয়েছে। তা হলো: দীনের হেফাযত এবং সামাজিক শৃঙ্খলা, যেটাকে কুরআনে কারীমে 'দিফা' তথা অন্যায় প্রতিরোধ করা শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ

অর্থঃ "যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে অন্যদলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হত।" [সূরা বাকারা ০২:২৫১]

সুতরাং বলা যায়, জিহাদের বিধান দেয়াই হয়েছে বিশেষ প্রয়োজনে। কারণ, যদি সকলে ইসলাম গ্রহণ করতো তাহলে জিহাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। যদি কেউ রাসূলকে দাওয়াত থেকে বাধা না দিত তাহলেও জিহাদের বিধান আসত না। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যেহেতু এ জরুরত সব সময়ই থাকে এবং সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেহেতু জিহাদের ফরযিয়্যাতও সর্বদা ফরয থাকবে, যা আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তা একটি প্রশংসনীয় আমলও বটে। যেন জিহাদ একটি মৌলিক ইবাদত, শুধু প্রয়োজনে করবে এমন নয়, বরং সব সময়ের জন্য ফরয। কারণ, সকল মানুষ একত্রে ইসলাম গ্রহণ করবে, সবাই দীন ইলম ও

হেদায়াতের অনুগত হয়ে যাবে, আল্লাহর পথ থেকে বাধাদানকারী কেউ পৃথিবীতে থাকবে না এমন তো ভাবা যায় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

অর্থঃ "আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তাদের পরবর্তীকালের মানুষ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসে যাওয়ার পর আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু তারা মতবিরোধে লিপ্ত হলো। তাদের মধ্যে কিছু তো এমন, যারা ঈমান এনেছে এবং কিছু এমন, যারা কুফর অবলম্বন করেছে। আল্লাহ চাইলে তারা আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ সেটাই করেন যা তিনি চান।" **[সূরা বাকারা ০২:২৫৩]**

জিহাদের হাকীকত

জিহাদের হাকীকতই হচ্ছে লড়াই করা হত্যা করা। তবে রাসূল প্রেরণ, কিতাব নাযিলের মূল মাকসাদ কিন্তু মানুষকে হত্যা করা নয়। কারণ, রাসূলদের প্রেরণ এবং কিতাবসমূহ নাযিলের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানবজাতির হেদায়াত; তাদের হত্যা করা নয়। হ্যাঁ হেদায়াতই প্রধান উদ্দেশ্য।

তবে সর্বজ্ঞানী সত্তার জানা আছে যে কিছু মানুষ থাকবে এসব (রাসূল প্রেরণ, কিতাব নাযিল) তাদের কোনো কাজে আসবে না। কিতাব ও রাসূলের দিকে তারা মাথা তুলেও তাকাবে না। বরং তারা তার বিরুদ্ধে থাকবে, তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা দিবে। আর এসব লোককে হেদায়াতের কথা দিয়ে প্রতিহত করা সম্ভব নয়, বরং মুখোমুখি লড়াইয়ের প্রয়োজন। এসব বিরুদ্ধবাদীর মুছে ফেলার মধ্যেই পৃথিবীর এবং মানবজাতির শৃঙ্খলা। তাই তিনি জিহাদ তথা লড়াই ও হত্যার নির্দেশ দিলেন। জিহাদকে তাঁর ভালোবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নির্ধারণ করলেন এবং সেটাকে বানালেন তাঁর বন্ধু ও শত্রুর এক পার্থক্য রেখা। এর বিনিময়ে দেবেন সর্বোত্তম প্রতিদান। কারণ একজন মানুষ আপন প্রাণ, রক্ত অস্তিত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পথে বিলিয়ে দিচ্ছে আপন দীনের খাতিরে। সুতরাং হত্যাপোযুক্ত কাফেরদের হত্যা করার মানে শরীরের ঐ রোগাক্রান্ত অঙ্গটি কেটে ফেলা, যার

নিরাময়ের আশা করা যায় না। যদি সেটাকে আপন অবস্থায় রেখে দিয়ে কেটে ফেলা না হয় তাহলে শরীরের বাকি অঙ্গগুলোও আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

তেমনি মাঝে মধ্যে মুজাহিদদের মাঝে ছোটখাটো হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে, সেটাকে আমরা এরকম ভাবতে পারি; বড় কোনো বিশৃঙ্খলা দমন করতে ছোটখাটো বিশৃঙ্খলা মেনে নেয়া। এটাও জিহাদের একটা নীতি।

সুতরাং জিহাদকে মানব হত্যা বা কোনো হত্যাকাণ্ড বলা যাবে না। আল্লাহর পানাহ! আমরা বিষয়টি বোঝার জন্য এবং ব্যাখ্যার জন্য এভাবে বলছি। অন্যথায় আল্লাহ যার আদেশ করেছেন তাই একমাত্র কল্যাণকর এবং উপকারী। কারণ, বড় কোনো বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য ছোটখাটো হত্যাকাণ্ড করা কোনো বিশৃঙ্খলা নয়। সেটাই শৃঙ্খলা ও কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা সর্বদা ন্যায়, কল্যাণ ও সংশোধনের আদেশ করেন, তিনি কখনো খারাপের নির্দেশ করতে পারেন না। তিনি ফাসাদকে ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।

প্রচলিত সংশয়: কেউ কেউ জানতে চান:

আমরা দেখছি, মুজাহিদ, উম্মাহর যুবক ও ইসলামী আন্দোলনের ভাবধারার জিহাদী চেতনা লালনকারী লোকদের কঠোরতার দিকে ঝোঁক বেশি, যা অন্য দল ও আন্দোলনের সদস্যদের মধ্যে নেই। তাদের মাঝে আমরা একটু বেশিই কঠোরতা ও রুক্ষতা লক্ষ করেছি। এ স্বভাব তাদেরকে কঠিন সব সিদ্ধান্ত বেছে নিতে বাধ্য করবে। কখনো কখনো এমন কাজও করে বসবে যা শুধু অমানবিকতাই না; নির্দয়তাও বটে। এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তরঃ

আপনি যেটা বলেছেন, জিহাদী দলগুলো অন্য দল ও সংগঠন থেকে অনেক কঠোর হয়। যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে এটা অভ্যাস হয়ে গেছে ভাবতে হবে। কারণ তারা প্রতিনিয়ত কঠোর বিষয়ের সাথে দিনাতিপাত করে। যেমন যুদ্ধ লড়াই হত্যা মাথা উড়িয়ে দেয়া রক্ত ঝরানো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে ফেলা, বাড়ি-ঘর গুঁড়িয়ে দেয়া। শত্রুদের মুখোমুখি হয়েও তাঁদের কঠোরতার আচরণ করতে হয়। তাহলে যে কখনো কঠোরতা দেখেনি, বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত, দুনিয়ার

ভালোবাসা ও কিতালের প্রতি ঘৃণা যার মনে ঢুকে আছে সে মুজাহিদদেরকে দেখলেই নিষ্ঠুর, নির্দয়, কঠোর বলবে এটা স্বাভাবিক। অথচ বাস্তবে তারা দুর্বলদের প্রতি সদয় দয়াশীল ও স্নেহময়। মোটকথা, মুজাহিদদের ব্যাপারে এমন দাবি পুরোই বানোয়াট, যার বাস্তবতা নেই। যদি এ দাবি সহীহ ধরে নিই, তাহলে বলতে হবে এটা কঠিন ও কঠোর বিষয়ের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে। তাও এই আচরণ কতকের সাথে দেখানো হয়। সবার ক্ষেত্রে নয়। কেননা জিহাদ সব সময় সত্য ও হক আর মুজাহিদরা শরীয়তের প্রতি দৃঢ় সংকল্প, তাকওয়া, ফিকহ, ইলম ও জিহাদের অধিকারী। তাদেরকে সঠিক নেতৃত্ব দেয়া হয়। তাদের চরিত্র, চিন্তা-ভাবনা ন্যায্য ও উত্তম। অন্যদের সাথে তাদের কোনো তুলনা করা যায় না।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ: "এ স্বভাব তাদেরকে কঠিন সব সিদ্ধান্ত বেছে নিতে বাধ্য করবে। কখনো কখনো এমন কাজও করে বসবে যা শুধু অমানবিকতাই না, বরং নির্দয়তাও!"

প্রশ্নকারী এ কথাটা দ্বারা এমন সব হালতের কথা বুঝাচ্ছেন যখন মুজাহিদ ভাইদের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে। এটার বহু কারণ থাকতে পারে। শুধু জিহাদী অনুশীলনের কারণে না। এটা মুজাহিদ ছাড়াও অন্যদের মাঝেও হয়ে থাকে। দেখা যায় কখনো অন্য দলগুলো মুজাহিদদের থেকেও অধিক কঠোর হয়, বরং অনেক নির্দয় ও দাম্ভিক হয়ে থাকে। কঠোর কেবল জিহাদ-মুজাহিদদেরকেই বলা হয় অথচ কঠোরতা, রুক্ষতা, রূঢ় আচরণ সব দলের মাঝেই পাওয়া যায়। তাহলে কেন আপনি জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে কঠোর বলে বলে জুলুম করেন?

সর্বাবস্থায় হককে গ্রহণ করে নিতে হবে। আর বাতিলকে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য করুন যারা কথা শোনে, এরপর উত্তম কথার অনুসরণ করে। তারাই ঐ সমস্ত লোক যাদের আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন এবং তারাই জ্ঞানের অধিকারী।

অষ্টম মজলিস

দ্বিতীয় হিকমাহ :

(উক্ত হাদীসাংশের প্রথম হিকমাহ দ্বিতীয় মাজলিসে আলোচিত হয়েছে)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে খায়বারের পতাকা তুলে দিয়ে তাঁকে নসীহত করে বলেন :

ولا تلتفت

"কোনো দিকে তাকিও না।"

তিনি তাঁকে আরও বলেছিলেন:

انفذ على رسلك. ولا تلتفت

"তুমি ধীরগামীতার সাথে চলতে থাক, কোনো দিকে তাকিও না.."

আমরা সহীহ মুসলিমের বর্ণনা উল্লেখ করেছি, তাতে এভাবে আছে : "তুমি হাঁটতে থাকো, আল্লাহ বিজয় দান করা পর্যন্ত কোনোদিকে তাকিও না।" এ হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন : তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু চলতে থাকলেন, এরপর থামলেন, কিন্তু কোনোদিকে তাকালেন না। তারপর চিৎকার দিয়ে বললেন: "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কিসের উপর মানুষের সাথে লড়াই করবো?" মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার বর্ণনায় এ শব্দে আছে: "তুমি দাঁড়াও, তারপর চলো এবং লড়াই করতে থাকো; আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করা পর্যন্ত কোনোদিকে তাকিও না।" তিনি আর পিছনে দেখেননি। তিনি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু পিছনে ফিরে তাকাননি। তাই তিনি বললেন: "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কিসের উপর তাদের সাথে লড়াই করবো?"

তখন তিনি বললেন: "যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে...।"

পিছনে তাকাতে নিষেধ করার অর্থ হলো, (যুদ্ধের ময়দানে) অটল থাকার নির্দেশকে আরও জোরদার করা। এটা এমন তাকীদ যুক্ত আদেশ যার বিপরীত করা মোটেও অনুমোদিত নয়।

এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, প্রাসঙ্গিক কোনো কাজে নিজেকে এত ব্যস্ত করা যাবে না যে মূল উদ্দেশ্য থেকেই উদাসীন হয়ে পড়বে, তার সামর্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে, কিংবা মনোবল হারিয়ে বসবে।

তদ্রূপ মুজাহিদদের উচিত যুদ্ধে বের হওয়া এবং আদিষ্ট বিষয় নিয়ে অটল থাকা কোনোদিকে না তাকানো। তাদের ফোকাস থাকবে স্পষ্ট ও বড় উদ্দেশ্যের দিকে। তার মূল কাজে আসবে না এমন কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত করা যাবে না। বরং এমন প্রাসঙ্গিক কাজ তার মনোবল নষ্ট করে দিবে। আমরা এ বিষয়টি সামনে আরও স্পষ্ট করবো ইনশাআল্লাহ।

ফায়দা :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার জন্য আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু পিছনে ফিরে তাকাননি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর এই কাজকে সমর্থন করেছেন। এটাই নবীর প্রতি তাঁর অধিক আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। আর যুদ্ধের ময়দানে এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আনুগত্যেরই প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান পরিভাষায় যেটাকে

(الحرفية التطبيق الحرفي. الانضباط العسكري) - তথা, অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করা, সামরিক কমান্ড বলা হয়। যুদ্ধের ময়দান আর সমঝোতা অনুগ্রহের অঙ্গন এক নয়। এখানে আমীরের পক্ষ হতে যে আদেশই আসে তা মেনে নিতে হবে কোনো ব্যাখ্যা ও ভিন্ন তাতবীকের চেষ্টা করারও সুযোগ নেই। হ্যাঁ যদি নিশ্চিত কোনো বৈপরীত্য থাকে তখন দ্বিমত করা যাবে। এটা খুব বিরল পরিস্থিতি যা আমদের মূল আলোচনার বিষয় না।

বরং আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে, আমাদের জন্য আমীরের পক্ষ হতে যে সকল নির্দেশ করা হয় সেগুলো আমাদের কোনো দ্বিধা ছাড়া মেনে নিতে হবে। যেমন আমীর যদি কয়েকজন সৈন্যকে বলে, তোমরা এখানে বসে থাকো নড়াচড়া করবে না বা অমুক স্থানে যাবে না। এরপর সৈন্যরা কিছুক্ষণ বসে থাকার ঘটনা

স্থলে কোনো হালকা পরিবর্তন দেখলেই যদি ব্যাখ্যা করা শুরু করে দেয় যে, আমীর সাহেবের এ উদ্দেশ্য ছিল, এমন উদ্দেশ্য ছিল না তার উদ্দেশ্য এমন এমন। -তোমরা কি জানো তার কি উদ্দেশ্য ছিল?-

এরপর যদি তারা আমীরের নির্দেশ লঙ্ঘন করে জায়গা থেকে উঠে চলে যায়। তখন ছোট বড় কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটে যেতে পারে। আল্লাহ সাহায্যকারী।

যার ব্যাপারে এমন অভিযোগ পাওয়া যাবে এবং বারবার সে এমনটা করবে সে সৈন্য হবারই যোগ্য না। মুজাহিদদের সাথে থেকে তার কোনো ফায়দা নেই। বরং কখনো কখনো এরা মুজাহিদদের জন্য ক্ষতিরও কারণ হয়। তাই এদের থেকে বেঁচে থাকা এবং মুজাহিদদের কাতার থেকে দ্রুত তাকে অপসারণ করতে হবে। এ জন্যই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রত্যেক সদস্যের তারবিয়াতের জন্য পরীক্ষা ও আমলের সুযোগ দেয়া হয়, যাতে করে জানা যায় ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যকারী সৈনিক হওয়ার যোগ্য কিনা এবং পর্যায়ক্রমে তাকে দায়িত্বের স্তরে উন্নীত করা হবে। পাশাপাশি জানা যাবে কাকে একাজে আরও দৃঢ় করতে হবে আর কে এই অঙ্গনে নিষ্ফল।

মোটকথা, আমীরের কথাকে বাহ্যিকের উপরই ধরতে হবে। শুধু যদি সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ থাকে তার কথাকে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে ধরার তখন ভিন্ন উদ্দেশ্যে নেয়া যাবে। সর্বাবস্থায় সব বক্তার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। বাহ্যিকের উপর ধরা। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় জরুরি। উহুদ যুদ্ধের তীরন্দাজদের ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে। এ ঘটনার মাহাত্ম্য, বড়ত্ব ও ফায়দা আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত হবে। এছাড়া কুরআনের সব ঘটনা ও দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য শিক্ষা।

আফসোস, এ ত্রুটি আমাদের মাঝে বিদ্যমান। হিকমাহ ও ইলমের নূর দ্বারা তা সংশোধন করতে হবে। জাহিল ও মূর্খদের শুদ্ধ করতে হবে। শূন্যতা পূরণ করতে হবে। উশৃঙ্খল ও উদাসীনদের কাজ থেকে বাধা প্রদান করতে হবে।

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

অর্থঃ “যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।” [সূরা তালাক ৬৫:০৩]

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

অর্থঃ “তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তিনিই তোমাদেরকে শিক্ষা দেন।”[সূরা বাকারা ০২:২৮২]

যে ধৈর্য ধরতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরার তাওফীক দেন। যে আল্লাহর কাছে পবিত্রতা চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র করেন। সব তাওফীক, সব ভরসা আল্লাহর উপর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন: আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে বাহ্যিকের উপর ধরেছেন। তাই তিনি প্রয়োজন সত্ত্বেও চোখ তুলে তাকাননি। এটাই হলো বাহ্যিকের উপর ভিত্তি করে রাসূলের কথার উপর আমল করা।

আমি বললাম: বিভিন্ন দিক থেকে আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ঘটনাও এরকম যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় ডাক দিলেন।

হাদীসটি হলো-

- كُنْتُ أُصَلِّي فِي المَسْجِدِ، فَدَعانِي رَسولُ اللَّهِ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فقالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟ ثُمَّ قالَ لِي: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هي أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمّا أَرادَ أَنْ

يَخْرُجَ، قُلتُ له: أَلَمْ تَقُلْ: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هي أعْظَمُ سُورَةٍ في القُرْآنِ؟ قالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) هي السَّبْعُ المَثانِي، والقُرْآنُ العَظِيمُ الذي أُوتِيتُهُ.

অর্থঃ আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাক দিলেন কিন্তু আমি জবাব দিইনি। নামাযান্তে আমি এসে বললাম : "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি নামাযে ছিলাম।" তিনি বললেন: "আল্লাহ কি বলেননি যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করে।" এরপর তিনি বললেন : "মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিখিয়ে দিবো যা কুরআনের সবচেয়ে উত্তম সূরা।" এরপর তিনি আমার হাত ধরলেন। এরপর তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন আমি বললাম : "আপনি তো আমাকে কুরআনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সূরা শিখাবেন বলেছিলেন।" তখন তিনি বললেন: "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, পুন পুন পঠিত সাত আয়াত ও সমস্ত কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।" [বুখারী, ৪৪৭৪]

অধিকাংশ আলেম বলেছেন: নামাযেও নবীজীর ডাকে সাড়া দেয়া আবশ্যক। এটা রাসূলের জন্য খাস ছিল। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করেছেন তাঁর ডাকে সাড়া না দেয়ার কারণে, যদিও তিনি নামাযে ছিলেন। আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, তিনি নামাযে ছিলেন। তাই তিনি নামায ছাড়তে চাননি। তবে তিনি দ্রুত নামায শেষ করে আসলেন। কিন্তু নবীজী তাঁকে বললেন যে তাঁর ডাকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়া আবশ্যক। এ আয়াতটি তিলওয়াত করলেন।

﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ﴾

অর্থঃ “তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কাজের দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।” [সূরা আনফাল ০৮:২৪]

এখানেও নির্দেশ রয়েছে যে, কোনো কথাকে প্রাথমিকভাবে তার বাহ্যিক অবস্থার উপর ধরতে হবে। দুটো ঘটনা দিয়ে আমরা সেটা বুঝিয়েছি।

বুখারীর টীকায় ইমাম সিন্ধী রহিমাহুল্লাহ বলেন : স্বাভাবিক আদেশ যদিও তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়ার কথা বুঝায় না। কিন্তু এখানে আয়াতে তো আদেশটা কয়েদযুক্ত। অর্থাৎ রাসূল তোমাদেরকে যখন ডাকবেন। সুতরাং ডাকার সাথে সাথে সাড়া দেয়া আবশ্যক।

ইমাম খাত্তাবী থেকে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ নকল করেন যে, উক্ত হাদীসে ব্যাপকতার সীগাহ ব্যবহার হয়েছে। আর ব্যাপকতার শব্দকে সবক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। আর হাদীসে বর্ণিত إذا দ্বারা উদ্দেশ্য এখানে ব্যাপকতা!

এটা থেকেই আল্লাহ ও রাসূলের কথায় ব্যাপকতার ফায়দা প্রতীয়মান হয়। তালেবুল ইলমরা যেন সেটা লক্ষ করে।

আল্লাহর কাছে আমরা সর্বদা প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের এবং তোমাদের ইলম বৃদ্ধি করে দিবেন! দীনের সমঝ দিবেন। আমীন।

নবম মজলিস

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা “তুমি পিছনে ফিরে তাকিও না” হাদীসের এই অংশ নিয়ে আমার দীর্ঘ তাদাব্বুরের কিছু ফলাফল পেশ করছি।

ইলতিফাত নিয়ে আলোচনাঃ

আভিধানিক অর্থ তো স্পষ্ট। যেকোনো দিকে শরীর, চেহারা বা দৃষ্টি ঘোরানো। এটাই মূল অর্থ। এ অর্থেই অধিক ব্যবহার হয়। বলতে পারেন এটাই তার হাকীকী অর্থ। তার আরেকটি রূপক অর্থও আছে -

ইলতিফাত বা দৃষ্টি ফেরানো কখনো কখনো কলব দিয়ে হয়। তখন অর্থ হবে; কোনো বিষয়ের বাস্তবতা বা তাৎপর্য জানার জন্য মন ও মেধার মাধ্যমে মনোনিবেশ করা। হতে পারে সেটা স্বেচ্ছায় ও কার্যকারিতার সাথে বা চিন্তা ও অনুভুতির সাথে।

এর চেয়ে স্পষ্ট কথা হলো: ইলতিফাত কখনো কল্যাণকর হয় কখনো অকল্যাণ। কখনো প্রশংসিত কখনো নিন্দিত।

আল্লাহ ও রাসূলের কথায় যত ইলতিফাত এসেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিষেধ রূপে এসেছে, তদ্রূপ দার্শনিক ও বাগ্মীদের বক্তব্যেও। সেটা এ কারণে যে, কাজের মূলনীতি হচ্ছে; মানুষ তার চিন্তা ও কাজের পথে নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে চলবে, যাতে সে একাধারে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। পথ চলার মাঝে কোনোদিকে তাকাবে না। কেননা কোনোদিকে তাকানো মানেই কাজের এসব সিফাত থেকে বের হয়ে যাওয়া।

যেমন কুরআনুল কারীমে এসেছে-

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾

অর্থঃ "(অবশেষে) ফিরিশতাগণ (লুতকে) বলল, আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত ফিরিশতা। তারা কিছুতেই আপনার পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। আপনি রাতের কোনো অংশে আপনার পরিবারবর্গ নিয়ে জনপদ থেকে বের হয়ে পড়ুন। আপনাদের মধ্য হতে কেউ যেন পেছনে ফিরেও না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ছাড়া (সে আপনাদের সাথে যাবে না)। তার উপরও সেই বিপদ আসবে, যা অন্যদের উপর আসছে। নিশ্চয়ই, তাদের (উপর শাস্তি নাযিলের) জন্য প্রভাতকাল স্থিরীকৃত। প্রভাতকাল কি খুব কাছে নয়?" [সূরা হুদ ১১:৮১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾

অর্থঃ "সুতরাং আপনি রাতের কোনো এক অংশে নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে বের হয়ে পড়ুন এবং নিজে তাদের পিছনে পিছনে চলুন। আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে ফিরে না দেখে এবং আপনাদেরকে যেখানে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেখানকার উদ্দেশ্যে চলতে থাকুন।" [সূরা হিজর ১৫:৬৫]

হুবহু ইলতিফাত শব্দ বা এমন অর্থ ধারণকারী শব্দ ব্যবহার করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে নামাযে এদিক সেদিক তাকানোর ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। যেমন–

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত–

سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الِالْتِفاتِ في الصَّلاةِ؟ فَقالَ: هو اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِن صَلاةِ العَبْدِ.

অর্থঃ তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি বললেন: "এটা একটা ছিনতাই যা শয়তান বান্দার নামায থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়!" – (বুখারী ৭৫১)

অন্য হাদীসে আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

لا يزالُ اللَّهُ مُقبلًا على العبدِ ما لم يلتَفِت، فإذا صرَفَ وجهَهُ انصرفَ عنهُ

অর্থঃ তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "নামাযে বান্দা যতক্ষণ এদিক সেদিক তাকায় না আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সামনে থাকেন। যখনই সে তার চেহারা ঘুরিয়ে ফেলে তখনই তিনি সরে যান।" - আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খুজাইমা, ১/৫৩৯।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

أوصاني خَليلي ﷺ بثلاثٍ، ونَهاني عن ثلاثٍ: نَهاني عن نَقرةٍ كنقرةِ الدِّيكِ، وإقعاءٍ كإقعاءِ الكَلبِ، والتفاتٍ كالتِفاتِ الثَّعلبِ

অর্থঃ তিনি বলেন, আমার প্রিয় আমাকে তিনটি বিষয়ের আদেশ এবং তিনটি বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন; মোরগের মতো ঠোকর খেতে, কুকুরের মতো বসা থেকে এবং শিয়ালের মতো এদিক সেদিক তাকানো থেকে নিষেধ করেছেন।" আততারগীব ওয়াততারহীব, ১/২৫৫।

এক প্রসিদ্ধ হাদীসে - হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন:

....فقال: "إنَّ اللهَ أمَرني بخَمسِ كلماتٍ أن أَعمَلَ بِهِنَّ، وآمرُكم أن تَعمَلوا بِهِنَّ: أوَّلُهنَّ أن تَعبُدوا اللهَ ولا تُشرِكوا به شيئًا، وإنَّ مَثلَ مَن أشرَك باللهِ كمثَلِ رجلٍ اشترى عبدًا مِن خالصِ مالِه بذهَبٍ أو ورِقٍ، فقال: هذه داري وهذا عمَلي، فاعمَلْ وأدِّ إليَّ، فكان يعمَلُ ويُؤدِّي إلى غيرِ سيِّدِه، فأيُّكم يَرضى أن يكونَ عبدُه كذلك؟! وإنَّ الله أمركم بالصَّلاة، فإذا صَلَّيتُم فلا تَلتَفِتوا؛ فإنَّ اللهَ يَنصِبُ وجهَه لوجهِ عبدِه في صلاتِه ما لم يَلتفِتْ، وآمرُكم بالصِّيامِ.....

অর্থঃ "আল্লাহ আমাকে পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করার আদেশ করেছেন আমিও তোমাদেরকে সেগুলো অনুযায়ী আমল করার আদেশ করছি। প্রথম হলো,

তোমার আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কখনো কাউকে শরীক করবে না। কেননা যে আল্লাহর সাথে শিরক করে সে এমন ব্যক্তির মতো যে তার খাঁটি সোনা বা রূপা দিয়ে একটা গোলাম ক্রয় করে বলল, এটা আমার বাড়ি আর এটা আমার কাজ। তুমি কাজ করে আমাকে পারিশ্রমিক দিবে। অথচ গোলামটি কাজ করে অন্যকে পারিশ্রমিক দেয়। তোমাদের কেউ কি এমন গোলামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে? আল্লাহ তোমাদেরকে নামাযের আদেশ করেন, সুতরাং তোমরা যখন নামায পড়বে তখন এদিক সেদিক তাকিও না। কারণ নামাযে আল্লাহ বান্দার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকেন যতক্ষণ না সে এদিক সেদিক তাকায়। আমি তোমাদেরকে রোযার আদেশ করছি...।” (তিরমিযী, ২৮৬৩)

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রহিমাহুল্লাহ তাঁর মুসান্নাফে ইবনে জুরাইজ এর সূত্রে আতা থেকে বর্ণনা করেন-

وروى عَبْد الرزاق، عَن ابن جُرَيْج، عَن عَطَاء: سَمِعْت أبا هُرَيْرَةَ يَقُول: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت؛ فإنه يناجي [ربه] إن ربه أمامه، وإنه يناجيه، فلا يلتفت .قَالَ عَطَاء: وبلغنا أن الرب - عز وجل - يَقُول: ((يابن آدم، إلى أين تلتفت، أنا خير ممن تلتفت إليه.

অর্থঃ “তিনি (আতা) বলেন : আমি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, “যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে তখন সে যেন এদিক সেদিক না তাকায়। কারণ সে তাঁর প্রতিপালকের সাথে একান্তে কথা বলছে। এবং তাঁর রব তার সামনে রয়েছেন। তিনিও তার সাথে একান্তে কথা বলছেন। আতা বলেন: এমনটা আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে রব বলেন, এ বনি আদম! কার দিকে তাকাচ্ছ! আমি তার থেকে উত্তম যার দিকে তুমি তাকাচ্ছো”।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত কিতাব তামহিদে উল্লেখ করেন; “নামাযে এদিক সেদিক তাকানোর নিষেধাজ্ঞার বহু হাদীস এসেছে, আহলে ইলমগণের নিকট হাদীসগুলোর ব্যাখ্যার সারাংশ তেমনি, যেমনটি আমি উল্লেখ

করেছি। নামাযে এদিক সেদিক তাকানো মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ইজমা রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

الالتفاتُ في الصلاةِ خلسةٌ يختلسُها الشيطانُ من صلاةِ العبدِ

অর্থঃ “নামাযে এদিক সেদিক তাকানো বান্দার নামাযের অংশ ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া।” (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ৪৫৬৫)

জমহুর ফুকাহার মতে এদিক সেদিক তাকানো নামায নষ্ট করে না, যদি তা সামান্য হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত ফিকহের কিতাবাদিতে জানতে পারবো।”

ফায়দা :

বর্ণিত আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এদিক সেদিক তাকাতেন কিছু মাসলাহাতে। সাহল ইবনে হানযলিয়্যাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ - يَعْنِي صَلاَةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ .

অর্থঃ “তিনি বলেন, একদা ফজর সালাতের ইকামাত দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত আদায় করতে লাগলেন এবং সালাতের অবস্থায়ই তিনি গিরি পথের দিকে তাকাচ্ছিলেন”।

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গিরিপথ পাহারা দেয়ার জন্য রাতে এক অশ্বারোহীকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। (সেজন্যই তিনি সেখানে দৃষ্টি ফিরাচ্ছিলেন)। সুনানে আবু দাউদ, ৯১৬। সহীহ ইবনে খুজাইমাতে ইবনে খুজাইমা রহিমাহুল্লাহ ও মুস্তাদরাকে হাকেম রহিমাহুল্লাহ এটাকে সহীহ বলেছেন।

এটা জিহাদ ও নামায একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর বক্তব্যের মর্ম এমনই:

তিনি বলেন-

قال عُمَرُ: إنِّي لأُجَهِّزُ جيشي، وأنا في الصلاةِ.

অর্থঃ "আমি নামাযে থাকাবস্থায়ই সৈন্য প্রস্তুত করেছি।" (শরহুস সুন্নাহ, ৩/২৫৭)

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর উল্লেখিত বক্তব্যের বিষয়ে ইবনে রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ বলেন : উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নামাযের মধ্যে সৈন্য প্রস্তুত করার চিন্তা করাটা খারাপ কোনো বিষয় না। বরং এটা এক প্রকার জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, আর জিহাদের বিষয়ে ছিল তাঁর অনেক গুরুত্ব। তিনি নামাযে এবং নামাযের বাইরে এ নিয়ে চিন্তা করতেন। তেমনিভাবে ইরাকে সারিয়া ইবনে যানিম রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সৈন্যবাহিনীর বিষয়টিও ছিল তাঁর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একদা তিনি জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন তখন আল্লাহ তাঁর কাছে ইলহাম করেন যে মুসলিম সৈন্য বাহিনীকে শত্রু ঘিরে ফেলেছে, তখন, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডাক দেন, অন্যদিকে সারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ডাক শুনতেন পান এবং যেভাবে আদেশ করেন সেভাবে পালন করেন। আর এটাই বিজয়ের কারণ ছিল। সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার কাছে বর্ণনা পৌঁছেছে যে, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি নামাযে থাকাবস্থায়ই বাহরাইনের জিযিয়া হিসাব করি। ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এভাবে বলেছেন। এ সবকিছু হচ্ছে জনগণের ব্যাপারে তাঁর অধিক গুরুত্ব দেয়ার প্রমাণ। তাই এসব চিন্তা তাঁর নামাযে প্রবল হত। একই সময়ে নামায, জনগণ ও নেতৃত্বের কাজ তাঁর সামনে একত্রিত হত। তিনি (সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এগুলো সব একত্রে কয়েক রকম ইবাদত

করার মতো। এটা নামাযে মন্দ করার মতো না। (ইবনে রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ)

আরও কিছু হাদীসঃ

আবু সাঈদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

أفضلُ الجهادِ عند اللهِ يومَ القيامةِ الَّذين يلتقون في الصَّفِّ الأوَّلِ فلا يلفتون وجوهَهم حتّى يُقتلوا أولئك يتلبَّطون في الغرفِ من الجنَّةِ يضحكُ إليهم ربُّك وإذا ضحِك إلى قومٍ فلا حسابَ عليهم

অর্থঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ শহীদ হচ্ছে যে প্রথম সারিতে থেকে শত্রু মোকাবেলা করে এবং নিহত হওয়া পর্যন্ত মাথা ঘুরায় না। তারা জান্নাতের কক্ষগুলোতে গড়াগড়ি খাবে, আর তাদের রব তাদেরকে দেখে হাসবেন। আর তোমার রব যখন কোনো কওমের দিকে তাকিয়ে হাসবেন তাদের কোনো হিসাব নেই।" (তাবারনী, ইমাম মুনযিরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণিত। ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ নুআইম ইবনে আম্মার থেকে হাদীসটি এমনই বর্ণনা করেন।)

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إذا حدث الرجُلُ بالحديثِ ثمَّ التفتَ، فهي أمانةٌ

অর্থঃ "যখন কোনো লোক কোনো কথা বলে সে যাওয়ার পর তা আমানত।" (তিরমিযী, ১৯৫৯)

আল্লাহ তাআলার সর্বোত্তম সৃষ্টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাগুণ সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তাঁর সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন :

اتَّبَعْتُ النبيَّ ﷺ، وخَرَجَ لِحاجَتِهِ، فَكانَ لا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ منه، فَقالَ: ابْغِنِي أحْجارًا أسْتَنْفِضْ بها - أوْ نَحْوَهُ - ولا تَأْتِنِي بعَظْمٍ، ولا رَوْثٍ، فأتَيْتُهُ بأَحْجارٍ بطَرَفِ ثِيابِي، فَوَضَعْتُها إلى جَنْبِهِ، وأَعْرَضْتُ عنْه، فَلَمّا قَضى أتْبَعَهُ بهِنَّ.

অর্থঃ "তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছু নিলাম, তিনি একটি প্রয়োজনে বের হয়েছিলেন। তিনি পিছনে তাকাননি। তখন আমি তাঁর কাছাকাছি চলে গেলাম। তখন তিনি বললেন, "আমার জন্য কয়েকটি পাথর খোঁজো আমি ইস্তিঞ্জা করব। হাড্ডি, গোবর নিয়ে এসো না। আর আমি কাপড়ে করে তাঁর জন্য কয়েকটি পাথর এনে তাঁর পাশে রাখলাম এবং সরে গেলাম। তিনি জরুরত পুরা করার পর সেগুলো ব্যবহার করলেন।" (বুখারী, ১৫৫)

মুসনাদে আহমদ, আল-আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারীতে সহীহ সনদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফাতের বর্ণনায় এসেছে, যখন তিনি কোনো দিকে ফিরতেন ভালোভাবে ফিরতেন।

যুবাইদী বলেন : উদ্দেশ্য হচ্ছে, দৃষ্টি লুকাতেন না। কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি কোনো দিকে তাকাতে ডানে বামে ঘাড় ঘোরাতেন না। এটা তো অস্থির, ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তি করে। বরং তিনি পুরোপুরি ফিরে যেতেন।

শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ সিলসিলায়ে সহীহায় উল্লেখ করেন: "যখন তিনি হাঁটতেন কোনোদিকে তাকাতেন না।" শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন;

হাদীসটির শাওয়াহেদ রয়েছে, তাই এটা সহীহ। তিনি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকেও একটু অতিরিক্ত অংশসহ মারফু হাদীস উল্লেখ করেন, সেখানে আছে: যখন তিনি হাঁটতেন দৃঢ়তার সাথে হাঁটতেন, এমনভাবে হাঁটতেন যে তাঁর মাঝে কোনো অলসতা দেখা যেত না। আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই মুচকি হাসতেন এবং তাকালে সম্পূর্ণভাবে তাকাতেন।" এ হাদীসের সনদ মুরসাল, সহীহ।

সহীহাইনে বর্ণিত আছে, সাহল ইবনে সাদ আস সাঈদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত :

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ذهبَ إلى بني عمرِو بنِ عَوفٍ ليُصلِحَ بينَهم وحانتِ الصَّلاةُ فجاءَ المؤذِّنُ إلى أبي بكرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ أتصلِّي بالنَّاسِ فأقيمَ قالَ نعَم فصلَّى أبو بكرٍ فجاءَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ والنَّاسُ في الصَّلاةِ فتخلَّصَ حتَّى وقفَ في الصَّفِّ فصفَّقَ النَّاسُ وكانَ أبو بكرٍ لا يلتفِتُ في الصَّلاةِ فلمَّا أكثرَ النَّاسُ التَّصفيقَ التفتَ فرأى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فأشارَ إليهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أنِ امكُثْ مكانَكَ فرفعَ أبو بكرٍ يدَيهِ فحمِدَ اللَّهَ علَى ما أمرَهُ بهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ مِن ذلِكَ ثمَّ استأخرَ أبو بكرٍ حتَّى استوَى في الصَّفِّ وتقدَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فلمَّا انصرفَ قالَ يا أبا بكرٍ ما منعَكَ أن تثبُتَ إذْ أمرتُكَ قالَ أبو بكرٍ ما كانَ لابنِ أبي قُحافةَ أن يصلِّيَ بينَ يدَي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ما لي رأيتُكم أكثَرتُم منَ التَّصفيحِ مَن نابَهُ شيءٌ في صلاتِهِ فليُسبِّح فإنَّهُ إذا سبَّحَ التُفِتَ إليهِ وإنَّما التَّصفيحُ للنِّساءِ»

অর্থঃ "একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আমর ইবনে আউফ গোত্রে গিয়েছিলেন তাদের মাঝে মীমাংসা করার জন্য। তখন নামাযের সময় হয়ে গেল। মুয়াজ্জিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বলল, আপনি কি নামায পড়াবেন তাহলে আমি ইকামত দিব? এখন তিনি বললেন হ্যাঁ, এরপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়ালেন। লোকেরা নামায পড়া অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। তিনি কাজ থেকে ফারেগ হয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। তখন লোকজন শোরগোল শুরু করে দিল, কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পিছনে তাকালেন না। শোরগোল যখন খুব বেশি হলো তখন তিনি পেছনে তাকালেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইশারা করে বললেন, ওখানেই থাকো! আবু

বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাত উঠালেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আদেশ করার ব্যাপারে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর পিছনে এসে কাতার বরাবর দাঁড়ালেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গেলেন এবং নামায পড়ালেন। নামাযের পর বললেন, হে আবু বকর! আমি আদেশ করার পরও কেন তুমি দাঁড়ালে না? আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রাসূলের সামনে নামায পড়ানোর ইবনে আবি কুহাফার সাহস নাই। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন তোমরা শোরগোল শুরু করে দিলে! নামাযে যদি কোনো জিনিস কাউকে সন্দেহে ফেলে সে যেন তাসবীহ পড়ে। আর তাসবীহ পড়লে তার দিকে তাকানো হবে। শোরগোল তো নারীরা করে।" (বুখারী, ৬৮৪, মুসলিম, ৪২১)

দার্শনিক ও বাগ্মীদের কথায়ও ইলতিফাতের বহু উদাহরণ রয়েছে :

রাস্তায় চলাচলে যে এদিক সেদিক বেশি তাকায়, সে হয় ভীত সন্ত্রস্ত না হয় চোর কিংবা অপরিচিত অথবা মুসাফির। এ ক্ষেত্রে মুজাহিদ ভাইদের জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে।

রাস্তায় চলাচলের সময় মুজাহিদ ভাইয়েরা এদিক সেদিক বেশি তাকাবেন না। পাশে বা পেছনে তাকানোর দরকার হলে কৌশল অবলম্বন করবেন। এগুলো শিখে নিতে হবে। বিশেষ করে নিরাপত্তার কোর্সগুলো। যেগুলো এ বিষয়ক স্বতন্ত্র আলোচনায় পাওয়া যাবে। মুজাহিদ ভাইদের উচিত তারা প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর বিষয়গুলো নিয়ে পরস্পর আলোচনা করবে। এটাও উপকারী জ্ঞান। কেননা এটাও জিহাদের অস্ত্র। এটাও একদিক থেকে ইদাদ তথা প্রস্তুতি। আল্লাহ তাওফীকদাতা।

পূর্বে একটা হাদীসের আলোচনা এসেছে-

إذا حدث الرجُلُ بالحديثِ ثمَّ التفتَ، فهي أمانةٌ

অর্থঃ "যখন কোনো লোক কোনো কথা বলে সে যাওয়ার পর তা আমানত।" [তিরমিযী, ১৯৫৯]

এর অর্থ হচ্ছে; তুমি ছাড়া এ কথাটা অন্য কেউ শোনা সে অপছন্দ করে। সুতরাং এটা আমানত রাখা জরুরি।

অন্যদিকে আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দম্ভের কারণে রাস্তায় চলাচলের সময় এদিক সেদিক তাকানো, পিছন থেকে কেউ তাদের সাথে কথা বলাকে অপছন্দ করেন। এই দ্বিতীয় প্রকারের চরিত্রটি অহংকারের সামিল বটে। আল্লাহর পানাহ্ !

যদিও এটার মৌলিক সহীহ অর্থ আছে, তা হচ্ছে; নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যাওয়া, কাজের সময় পিছনে ফিরে না তাকানো, দুর্বল, ভীতু ও সংশয়বাদীদের অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকা। কিন্তু অহংকারীরা এই আচরণগুলোর মধ্যে বাড়াবাড়ি করে থাকে। যেহেতু একজন মুসলিম নিজেকে শরীয়তের বিধানে আবদ্ধ রাখে, তাই তাদেরকে ঐ সকল আচরণ বর্জন করতে হবে যেগুলোতে বড়ত্ব প্রকাশ ও স্বতন্ত্রপরায়ণতা ছাড়া অন্য কোনো কল্যাণ নেই। বরং এটাই অহংকার। এর বিপরীতে মুসলিমরা সে আচরণগুলোকেই বাস্তবায়ন করবে যা তার জন্য দৃঢ়তা, অবিচলতা ও যথাস্থানে শত্রুকে ভীতি প্রদর্শনের কাজে আসবে। শত্রু-সম্মুখ ও তাকে ভয় প্রদর্শন করা ছাড়া সকল ধরনের অহংকারী চলাফেরা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। আল্লাহু আলাম।

যেমন, যে রাস্তায় চলতে এদিক সেদিক তাকায় না। কেননা তাকালে কারো মনে হতে পারে সে ভীত সন্ত্রস্ত, সন্দিহান, উদ্দেশ্যহীন বা কেউ নিজেকে তুচ্ছ মনে করে অন্যের দিকে না তাকালো, অথবা এই ভয়ে যে, তার দৃষ্টিতে কারো সমস্যা হতে পারে। এধরনের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে কোনো সমস্যা নেই। বরং এগুলো সহীহ, মুতাবার। এটাই উত্তম।

শরয়ী কারণ থাকা সত্ত্বেও যে কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ করা তরক করে। যেমন কেউ তাকে ডাকছে বা কোনো ভালো কাজের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে অথবা কোনো দুঃখিত ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা করছে তাও সে তাকালো না বরং হেঁটেই চললো। তাহলে এটা অতি মন্দ। নিকৃষ্ট আচরণ। তার মনে অহংকার রয়েছে। এটা সবচেয়ে বড় অহংকার। আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের হেফাযত করুন।

আলেমগণ রাস্তায় চলাচলের সময় এদিক সেদিক বেশি তাকানো অপছন্দ করতেন, এটাকে আত্মমর্যাদাহীন ও নির্বোধদের অভ্যাস হিসেবে উল্লেখ করেন।

ইবনুল মুফলিহ তাঁর 'আল-আদাবুশ শারইয়্যাহতে' উল্লেখ করেন : উমর ইবনুল আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ বলেন : নির্বোধ বা মুর্খের দুইটা স্বভাব যেন তোমার মাঝে না থাকে : এক. আশপাশে দৃষ্টি ঘোরানো আর পটপট উত্তর দেয়া। 'আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ' এবং 'বাহজাতুল মাজালিসে' আছে, ইবরাহীম নাখঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাস্তায় এদিক সেদিক তাকানো পুরুষত্বের ভেতরে পড়ে না।

****

আমরা সত্যপন্থী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যেই মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আমরা তারই অনুসারী। সেই আলোকে আমাদের মানহাজ ও কর্মপন্থা হলো: সৎকর্মশীল বা পাপিষ্ঠ শাসকবর্গের অধীনে হোক কিংবা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে— জিহাদ সর্বাবস্থায় শরীয়ত সম্মত ও বৈধ। আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা বিষয়ক এবং ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়টা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার চালিয়ে যাবার আবশ্যকতা লজ্বিত হবে। এ বিষয়ের ইসলামী আইন ও শিষ্টাচারের আলোকে সংশোধন ও শুদ্ধি কার্যক্রম, কল্যাণের পথে দাওয়াত, যথাসম্ভব ক্রটিগুলো সরিয়ে ফেলা সর্বাবস্থায় আবশ্যক।